দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২২ তম সংখ্যা ❖ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- গান্ধী এবং সাভারকর ইতিহাসের বিকৃতি ২
- মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাষণের তাৎপর্য ৫
- হামাস-ইজরায়েল গাজা সমঝোতা ৭
- দূষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফসল আরজিকর কাণ্ড ৮
- নেতাজি ও নজরুল-- এক বৃন্তে দুটি কুসুম ১১
- ইতিতহাসের পৃষ্ঠা থেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ১৩
- নাগরিক স্মৃতিচারণা মৌলবি মুজিবর রহমান এক বিস্মৃত সাংবাদিক ১৪
- ফিরে দেখা বাংলা উপন্যাসের ধারায় গৌরকিশোর ঘোষ ১৬
- বাংলাদেশে আদিবাসী বলে পরিচিতরা আক্রান্ত ১৮
- দারিদ্র্য পরিমাপ না নয়া-উদারিকরণের রূপচর্চা? ২০
- পাকিস্তানের 'দুবাই' গদরে কেন বালুচদের প্রতিরোধ আর আক্রমণ ২২
- চাকদায় ISRDS এর উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রম ২৩
- ড. বি.আর.আম্বেডকর ও সংবিধানকে অপমান সঙ্ঘ পরিবারের ২৪

➲সম্পাদকীয়

মহা কুম্ভ মেলায় ' শাহী ' বিপর্যয়

গত ২৮ জানুয়ারি বুধবার মধ্যরাতে কুম্ভমেলায় ছিল পূণ্য স্নানের বিশেষ দিন। হিন্দু ধর্মের পরিভাষায় ' শাহী স্নান ' যোগ।ওইদিন ছিল তিথি অনুযায়ী ' মৌনী অমাবস্যা।' এখন প্রশ্ন হল হিন্দু ধর্মের পূণ্য দিবসটিকে চিহ্নিত করার জন্য কি করে 'শাহী' শব্দটি যুক্ত হল ? এটিতো একটিফ ারসি শব্দ। ফারসি তো বিধর্মী ম্লেচ্ছদের ভাষা।হিন্দু ধর্মের স্বঘোষিত রক্ষক আর.এস.এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদেরসেবক ও প্রচারক যথামোদী , যোগী , মোহন ভাগবতরাতো এলাহাবাদের নাম পাল্টে 'প্রয়াগরাজ' করেছেন। মোগলসরাই নাম পাল্টে করেছেন 'দীনদয়ালউপাধ্যায়।' আর ' শাহী ' শব্দটা পাল্টাতে পারলেন না। হিন্দু ধর্মের একটি পবিত্রউৎসবে এ কি প্রবল মোগল অনাচার ?

যাইহোক এবারের কুম্ভ মেলাকে বলা হয়েছে 'মহা কুম্ভ মেলা।' এবার যেরকম গ্রহ নক্ষত্র'র সমাবেশ হয়েছে তা নাকি ১৪৪ বছর অন্তর হয়। যোগী বলেছিলেন বুধবার নাকি ৮ কোটি লোক হবে। গত একমাস ধরে সরকার ও মিডিয়া যে জাম্বো প্রচার চালিয়েছিল তাতে জন বিস্ফোরণ ঘটবে তা জানা ছিল। সাধুদের স্নানের জায়গা আলাদা, ভিআইপিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। আপাদমস্তক ধর্মীয় সংস্কারে নিমজ্জিত কোটিকোটি সাধারণ মানুষের জীবনের কানাকড়ি মূল্যও নেই। সামনের বছর উত্তর প্রদেশ বিধান সভা নির্বাচন। এই কুম্ভ ছিল মোদী যোগীদের তুরুপের তাস। কাল যোগীর বিবৃতিতে প্রাণ হানি নিয়ে একটা কথাও নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদী আসবেন আগামী ৫ তারিখ বসন্তপঞ্চমী তিথির 'শাহী স্নান ' করতে। দেখা যাক এবার কি ' দৈববাণী ' ভেসে আসে।

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

গান্ধী এবং সাভারকর ইতিহাসের বিকৃতি

মৃদুলা মুখার্জি/আদিত্য মুখার্জি/সুচেতা মহাজন

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৩ অক্টোবর ২০২১,আমাদের জানায় যে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দাবি করেছেন যে 'সাভারকারের বিরুদ্ধে প্রচুর মিথ্যা ছড়ানো হয়েছিল। বারবার বলা হয় যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে একাধিক ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করেছিলেন। সত্য হল তিনি তার মুক্তির জন্য এই আবেদনগুলি দায়ের করেননি। সাধারণত একজন বন্দীর মুক্তি প্রার্থনা করে আবেদন করার অধিকার থাকে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, আপনি মুক্তির আবেদন করুন। গান্ধীর পরামর্শেই তিনি করুণার আবেদন করেছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী আবেদন করেছিলেন যে সাভারকরকে মুক্তি দেওয়া হোক। তিনি বলেছিলেন যে আমরা যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাচ্ছি, সাভারকরও তাই করবেন।' রাজনাথ আরও বলেন যে তঅনেকের মতের পার্থক্য থাকতে পারে, তবে তাকে (সাভারকার) অবজ্ঞার সাথে দেখা ঠিক নয়। তার দেশের জন্য অবদানকে অবমাননা করার কাজ বরদাস্ত করা হবে না। ''হুমকি লক্ষ্য করুন। গডসের মন্দির স্থাপন এবং তার বীর-পূজা করা সহ্য করা যায় তবে সাভারকারের সমালোচনা করা যাবে না''

সত্যটা কী ?

রাজনাথ সিংয়ের বিবৃতিটি সম্ভবত ১৯২০ সালের একটি নথির উপর ভিত্তি করে ভিডি সাভারকার এবং গণেশ সাভারকারের ভাই এনডি সাভারকারের কাছ থেকে গান্ধীজির কাছে একটি চিঠি, গান্ধীজির উত্তর এবং গান্ধীজির ইয়ং ইন্ডিয়াতে একটি নিবন্ধ। ঘটনাগুলি রাজনাথ সিংয়ের দাবির থেকে কিছুটা ভিন্ন। বিনায়ক দামোদর সাভারকর নয় বছর আগে ১৯১১ সালে,তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম ক্ষমাভিক্ষার আবেদন দায়ের করেছিলেন,এবং পরবর্তী বছরগুলিতে আরও অসংখ্য আবেদন করা হয়েছিল,এবং এমন কোন প্রমাণ বা দাবি নেই যে এগুলোর ক্ষেত্রে গান্ধীজির পরামর্শ ছিল ! সাভারকারের এরকম একটি আবেদন যেটি হোম মেম্বার স্যার রেজিনাল্ড ক্র্যাডককে ব্যক্তিগতভাবে জমা দেওয়া হয়েছিল, যখন তিনি ১৯১৩ সালে আন্দামান কারাগারে গিয়েছিলেন, তার মুক্তির জন্য, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব রেখে, সেটির থেকে উদ্ধৃতি 'সরকার যদি তাদের বহুবিধ অনুগ্রহ ও করুণাতে আমাকে মুক্তি দেয় তবে আমি সাংবিধানিক অগ্রগতি এবং ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্যের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারক না হয়ে পারব না যা আমার এই মুক্তির প্রধান শর্ত। আমি সরকারকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সবরকম সেবা করতে প্রস্তুত,যেহেতু আমার এই রূপান্তর বিবেকপূর্ণ তাই আমি আশা করি আমার ভবিষ্যত আচরণও তদনুযায়ী হবে। একমাত্র সর্বশক্তিমানই করুণাময় হতে পারে এবং তাই এই অপব্যয়ী পুত্র পিতামাতার তুল্য সরকারের দরজা ছাড়া আর কোথায় ফিরে যেতে পারে ?'

প্রসঙ্গত, ২২শে মার্চ,১৯২০-তে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সাভারকার সমর্থক জিএস খোপার্দে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তমিঃ সাভারকর এবং তাঁর ভাই একবার ১৯১৫ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে সরকারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছিলেন যে তারা, যুদ্ধ চলাকালীন, মুক্তি পেলে সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সেবা করা এবং সংস্কার বিল পাশ হওয়ার পর আইনটিকে সফল করার চেষ্টা করবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে'।এই প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে, হোম মেম্বার, স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট, নিশ্চিত করেন যে ক্ষমবিনায়ক দামোদর সাভারকরের কাছ থেকে দুটি পিটিশন গৃহীত হয়েছিল - একটি ১৯১৪ সালে এবং আরেকটি ১৯১৭ সালে,পোর্ট ব্লেয়ারের সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে।প্রথমটিতে তিনি যুদ্ধের সময় সরকারকে তার সর্বোচ্চ সাধ্যমত সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণভাবে ক্ষমা করা হোক। দ্বিতীয় আবেদনটি পরবর্তী প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলদ।

এইভাবে, এটা খুবই স্পষ্ট যে সাভারকর ১৯১১ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে অসংখ্য পিটিশন জমা দিয়েছিলেন, গান্ধীর কোনো পরামর্শ বা প্ররোচনা ছাড়াই, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং যেকোনো ক্ষমতায় তাদের সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।সুতরাং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য যে সাভারকর স্বেচ্ছায় ক্ষমার আবেদন করেননি বরং শুধুমাত্র মহাত্মার পরামর্শে তা করেছিলেন তা প্রকৃত ঐতিহাসিক নথি থেকে প্রমাণিত হয় না।

তাহলে এই গোটা ঘটনায় গান্ধীজি আসেন কোথায়? শুধুমাত্র ১৯২০ সালে, যখন কারাগারে থাকা দুই সাভারকার ভাইয়ের ছোট ভাই এনডি সাভারকর গান্ধীজিকে তাঁর পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, যখন তিনি দেখতে পান যে ব্রিটিশদের রাজকীয় ঘোষণার অধীনে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের তালিকায়(Royal Proclamation of Clemency)তার ভাইদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। গান্ধীজি উত্তর দিয়েছিলেন যে পরামর্শ দেওয়া কঠিন কিন্তু তিনি একটি সংক্ষিপ্ত আবেদনের খসড়া তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এছাড়াও, তিনি ২৬ মে, ১৯২০ সালে ইয়ং ইন্ডিয়াতে 'সাভারকার ব্রাদার্স' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, যেখানে তিনি রয়্যাল প্রক্লেমেশন অফ ক্লিমেন্সির কথা উল্লেখ করেন এবং উল্লেখ করেন যে এর অধীনে অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হলেও সাভারকার ভাইদের মুক্তি দেওয়া হয় নি।

Gandhiji' Letter to N D Savarkar তিনি বলেন, 'দুই ভাইই তাদের রাজনৈতিক মতামত ঘোষণা করেছেন এবং উভয়েই বলেছেন যে তারা কোন বিপ্লবী ধারনা পোষণ করেন না এবং যদি তাদের মুক্ত করা হয় তবে তারা সংস্কার আইনের অধীনে কাজ করতে চানখক্ষ্ম

(১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন) 'তারা উভয়েই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে যে তারা ব্রিটিশ সংযোগ থেকে স্বাধীনতা চায় না। বরং তারা মনে করে যে ব্রিটিশদের সাথে থেকেই ভারতের ভাগ্য সবচেয়ে ভালো করা যেতে পারে।'

উল্লেখ্য যে গান্ধীজীর নিবন্ধে কোথাও সাভারকারের মুক্তির আবেদন নেই, যেমনটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'মহাত্মা গান্ধী আবেদন করেছিলেন যে সাভারকরকে মুক্তি দেওয়া হোক।' গান্ধীজি তাদের মুক্তি না দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কারণ তারা 'জননিরাপত্তা' বা 'রাষ্ট্রের জন্য বিপদ' বলে মনে হয় নি, কিন্তু ব্রিটিশদের কাছে আবেদন করেন নি।বা গান্ধীজি কোথাও তাঁর প্রবন্ধে বলেন নি, যেমন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাবি করেছেন, 'আমরা যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাচ্ছি, সাভারকরও তাই করবেন।' বরং, গান্ধীজি জোর দিয়েছেন যে সাভারকর ভাইরা স্বাধীনতা চান না, এবং সংস্কার আইনের অধীনে কাজ করতে চান।

এই পুরো পর্বে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা আছে। মহাত্মা গান্ধীকে সাভারকারের জাতীয়তাবাদী পরিচয়পত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাক্ষী করে দেওয়া হচ্ছে, তাও এমন দুর্বল যুক্তির ওপরে ! জনসাধারণের মনে একটি ছবি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে যে গান্ধীজি এবং সাভারকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এমন পরিমাণে যে সাভারকার ক্ষমার আবেদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীজির পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং গান্ধীজি তার মুক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন।এটি সাভারকারের করুণার ভিক্ষাকে স্বাভাবিক করার একটি স্পষ্ট প্রয়াস যখন অন্যান্য অনেক জাতীয়তাবাদী তা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এমনকি গান্ধীজি নিজের জন্য কঠোরতম শাস্তি দাবি করেছিলেন।

ঘটনা আসলে কী যা আমাদের ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে?

Copyright Deccan Herald

১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে,যখন গান্ধীকে হত্যা করা হয়, সাভারকারকে ষড়যন্ত্রের মূলচক্রী হিসেবে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করা হয়।সর্দার প্যাটেল,যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে পুরো মামলার তত্ত্বাবধান করছিলেন, একজন বিচক্ষণ ফৌজদারি আইনজীবী হিসেবে, ব্যক্তিগতভাবে সাভারকারের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, অন্যথায় তিনি তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে রাজি হতেন না। তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'এটি সরাসরি সাভারকারের অধীনে হিন্দু মহাসভার একটি কট্টরপন্থী শাখার দ্বারা নির্ধারিত একটি ষড়যন্ত্রটি ছিল এবং গোটা বিষয়টা নজরে রেখেছিল'। (দুর্গা দাস, সর্দার প্যাটেল পত্রাবলী, ১৯৪৫-৫০, খণ্ড ৬,পৃ. ৫৬।)

হিন্দু মহাসভার অস্বীকৃতির প্রতিক্রিয়ায়, প্যাটেল ৬ মে, ১৯৪৮-এ হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে লিখেছিলেন তখন আমরা এই সত্যটি থেকে চোখ বন্ধ করতে পারি না যে মহাসভার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য এই ট্র্যাজেডির জন্য আনন্দিত হয় এবং মিষ্টি বিতরণ করে। এছাড়া, জঙ্গি সাম্প্রদায়িকতা, যা মহন্ত দিগ্বিজয় নাথ, প্রফেসর রাম সিং এবং দেশপান্ডের মতো ব্যক্তিদের সহ মহাসভার অনেক মুখপাত্র দ্বারা মাত্র কয়েক মাস আগে পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছিল, সেটিকে জননিরাপত্তার জন্য বিপদ হিসাবে বিবেচনা না করে উপায় নেই। RSS-এর মত একটি সংস্থা যারা গোপনে সামরিক বা আধা-সামরিক লাইনে সংগঠন পরিচালনা করে তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে।" (সর্দার প্যাটেল পত্রাবলী, খন্ড ৬, পৃ. ৬৬।)

প্যাটেল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আরো জানান যে, 'আরএসএস-এর কার্যকলাপ সরকার এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য একটি স্পষ্ট বিপদ তৈরি করেছে'। (জুলাই ১৮, ১৯৪৮, সর্দার প্যাটেল পত্রাবলী, খন্ড ৬, পৃ. ৩২৩।)

বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী বিজি খের প্যাটেলকে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস এবং মহাত্মার বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল যা পরিণতি পায় কিছু মহারাষ্ট্রীয়দের হাতে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার মধ্য দিয়ে।(বি জি খের কর্তৃক প্যাটেলকে লেখা পত্রাবলী, মে ২৬, ১৯৪৮, ঐ., খন্ড ৬, পৃ. ৭৭-৭৮।)

ফৌজদারি আইনের একটি প্রযুক্তিগত কারণে অনুমোদনকারীর সাক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য স্বাধীন প্রমাণের অভাবে গান্ধী হত্যার বিচারে সাভারকারকে অবশেষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।

যাইহোক, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, বিচারক জীবন লাল কাপুরের অধীনে ১৯৬৫ সালে গঠিত তদন্ত কমিশন অনেক প্রমাণের সন্ধান পেয়েছিল যা মূল মামলার বিচারকের কাছে উপলব্ধ ছিল না।সাভারকারের দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী, এ পি কাসার এবং জি ভি দামলে, যারা মূল মামলায় সাক্ষ্য দেননি, কাপুর কমিশনের সামনে মুখ খোলেন এবং অনুমোদনকারীর বিবৃতিকে সমর্থন করেন যখন সাভারকার মারা গেছেন।এটা সম্ভব ছিল যে তারা মূল মামলায় সাক্ষ্য দিলেসাভারকার দোষী প্রমাণিত হতেন।প্রকৃতপক্ষে, কাপুর কমিশন সর্দার প্যাটেলের মতোই একটি উপসংহারে পৌঁছেছিল 'এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ একত্রিত করলে সাভারকর এবং তার গোষ্ঠীর হত্যার ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও তত্ত্বের উপস্থাপনা সম্ভব নয়'। (মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট, ১৯৭০, পৃ.৩০৩, অনুচ্ছেদ ২৫.১০৬।)

গান্ধীজির হত্যার পরেই, ভারত সরকার, যার উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সর্দার প্যাটেল আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করে এবং এর প্রায় ২৫,০০০ সদস্যকে জেলবন্দী করে।নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হলে হিন্দু মহাসভা নিজেদের সংগঠন অবলুপ্ত করার পথ বেছে নেয়।গান্ধীজীর হত্যার সাথে তাদের যোগসূত্রে কলঙ্কিত, হিন্দু মহাসভা একটি কৌশলগত পশ্চাদপসরণ করে এবং এর প্রধান নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ১৯৫১ সালে ভারতীয় জন সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তখন থেকে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের প্রধান রাজনৈতিক

বাহন ছিল, ছিল হিন্দুত্ববাদের প্রথম সারির রাজনৈতিক দল, যতক্ষণ না এটি জরুরি অবস্থার পরে জনতা পার্টিতে মিশে যায় এবং তারপরে বিজেপি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

এটা সত্যিই পরিহাসের বিষয় যে, যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিজেদেরকে সবচেয়ে প্রবল জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যখন প্রকৃত সংগ্রাম চলছে তখন তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। সাভারকর, ১৯২৪ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, কখনও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে অংশ নেননি।প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন হিন্দুত্বের তত্ত্বের প্রবর্তক, যা প্রকৃত ভারতীয়দেরকে সংজ্ঞায়িত করেছিল যাদের পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি, ভারতে ছিল, যার ফলে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের বাদ দিয়েছিল এই বৃত্ত থেকে, যাদের পবিত্র ভূমি ভারতের বাইরে ছিল।হিন্দু মহাসভা ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে ক্রমশ ব্রিটিশদের অনুগত হয়ে ওঠে।যদিও অনুগত প্রবণতা আগেও ছিল, তাও প্রাথমিকভাবে এর কিছু নেতা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৩৭ সাল থেকে, যখন সাভারকর মহাসভার সভাপতি ও অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন , তখন থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের টেবিল থেকে ছুঁড়ে দেওয়া রুটির টুকরো খাওয়ার জন্য তারা মুসলিম লীগের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে তাদের মতপার্থক্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসে।যদিও কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলো ভারতীয়দের সম্মতি ছাড়াই ভারতকে যুদ্ধে একটি পক্ষ করার ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিল, হিন্দু মহাসভার নেতারা ব্রিটিশদের সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং ভারতীয়দের যুদ্ধ-প্রয়াসে অংশগ্রহণ করার এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন।মহাসভার সভাপতি হিসাবে সাভারকর হিন্দুদের কাছে আবেদন করেছিলেন 'ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত যুদ্ধ-প্রয়াসে অংশগ্রহণ করার' এবং 'কিছু মূখ' যারা এই নীতিকে 'সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা' হিসাবে 'নিন্দা' করে তাদের কথা না শোনার জন্য। (সাভারকর, হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃ. ২০৩।)

ব্যক্তিগতভাবে, সাভারকর ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে ভাইসরয়কে বলেছিলেন যে হিন্দু এবং ব্রিটিশদের বন্ধু হওয়া উচিত এবং একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসকে প্রতিস্থাপন করবে। (লিনলিথগো, ভাইসরয়, জেটল্যান্ডের প্রতি, সেক্রেটারি অফ স্টেট, ৭ অক্টোবর, ১৯৩৯, জেটল্যান্ড পেপারস, খন্ড ১৮, রিল নং ৬।)

এই ব্রিটিশ আনুগত্যের নীতি অনুসারেই, যখন ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলছিল, এবং গান্ধীজি সহ সমগ্র জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব জেলে ছিল, তখন হিন্দু মহাসভার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। হিন্দু মহাসভা সিন্ধ এবং এনডব্লিউএফপিতেও মুসলিম লীগের সাথে জোট সরকার গঠন করে। এটা অন্য কথা যে এই সমস্ত আনুগত্য তাদের নির্বাচনী সাফল্য এনে দিতে পারেনি এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তারা পরাজিত হয়েছিল!

আরএসএসও, একটি সংগঠন হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য বড় কোনো লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেনি। আরএসএস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট ছাড়াও অন্তত দুটি বড় আন্দোলন, ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠার পরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। এর কোনোটিতেই আরএসএস কোনো ভূমিকা পালন করেনি। হেডগেওয়ার, আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ১৯৩০ সালে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকার জন্য জেলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সংগঠন এবং তার সদস্যদের আইন অমান্য আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছে এটা খুব পরিষ্কার ছিল যে আরএসএস কে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।আরএসএস সম্পর্কে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দফতরের একটি নোটে বলা হয়েছে যে, 'কংগ্রেসের গোলযোগের সময় (১৯৪২) সঙ্ঘের সভায় বক্তারা সদস্যদের কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এই নির্দেশগুলি সাধারণত পালন করা হয়েছিল'।

গান্ধীজির হত্যার চার-পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে আরএসএস এবং জনসংঘ-বিজেপি শিবিরে কেন সাভারকারের বিষয়ে নীরবতা ছিল তা জিজ্ঞাসা করা অবশ্যই ন্যায্য। জনসাধারণের মনে গান্ধীজীর হত্যার সাথে সাভারকার যুক্ত থাকায় তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা কি রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী ছিল, এবং এখন অনেকটা সময় কেটে গেছে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জনসাধারণের স্মৃতি ক্ষয়িষ্ণু এবং সাভারকার এখন পুনরুত্থিত হতে পারে?এছাড়াও, জনসাধারণের ওপর নতুন আক্রমনাত্মক পর্বের অংশ হিসাবে 'হিন্দুত্ব'-এর উপর নতুন করে জোর দেওয়ার প্রয়োজনেই, ধারণাটির মূল স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। তাছাড়া, 'জাতীয়তাবাদী' বলে দাবি করা একটি দলের পক্ষে দেখানোর মত কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী না থাকাটা অস্বস্তিদায়ক। অতএব, জাতীয়তাবাদী প্রতিভূ খোঁজার মরিয়া প্রচেষ্টায়, সাভারকরকে সেই ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

সাভারকারকে ক্রান্তিবীর, আন্দামানের বিপ্লবী হিসাবে স্মরণ করে তার সাম্প্রদায়িকতার ওপর একটা জাতীয়তাবাদী আচ্ছাদন টানা হয়েছে। যে সাভারকর আন্দামানে বারবার ক্ষমা চেয়ে বিপ্লবীদের লজ্জিত করেছিলেন এবং তিনি যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অনুসারে তার মুক্তির পরে কখনই কোনও জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে অংশ নেননি, তা ভুলিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছিল। এবং ২০০৩ সালে, যখন বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ছিল, প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও, সংসদে সাভারকারের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছিল। কেউ বুঝবে যে সাভারকার সম্পর্কে ন্যূনতম সন্দেহ থাকলেও এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। এবং এখন নবতম সংযোজন মহাত্মা কর্তৃক অনুমোদিত

হিসাবে সাভারকারের বিব্রতকর ক্ষমার আবেদনগুলিকে প্রচার করে স্বাভাবিক করার মাধ্যমে বৈধতা দেওয়ার প্রচেষ্টা! উদ্দেশ্য হল উভয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উপস্থাপন করা এবং এইভাবে এই সত্যটি লুকানো যে তাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। হিন্দুত্বের তাত্ত্বিক এবং হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে সাভারকর গান্ধীজির, বিশেষ করে তাঁর অহিংসা এবং মুসলমানদের প্রতি অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাবের ধারাবাহিক এবং তীব্র সমালোচক ছিলেন। ভারত কাদের এই বিষয়ের তত্ত্বায়নে এর থেকে তীব্র বৈপরীত্য হতে পারে না। সাভারকর স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ক্ষুভারতকে অবশ্যই একটি হিন্দু ভূমি হতে হবে যা হিন্দুদের জন্যই সংরক্ষিত'। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে হিন্দুদের 'আমাদের নিজের ঘরে, হিন্দুস্থানে, নিজেদের জমিতে প্রভু হওয়া উচিত'। (হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, পৃষ্ঠা ৯২, ৬৩)। অন্যদিকে, গান্ধীজি, ১৯৪২ সালের আগস্টে বোম্বেতে তাঁর বিখ্যাত ভাষণে যেখানে তিনি 'ভারত ছাড়ো'র ডাক দিয়েছিলেন, দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন তারা ডঃ মুঞ্জে এবং শ্রী সাভারকরের মতো, তরবারির মতবাদে বিশ্বাসী, সেই সমস্ত হিন্দুরা মুসলমানদেরকে হিন্দু আধিপত্যে রাখতে চায়, আমি সেই অংশের প্রতিনিধিত্ব করি না। আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করি। কংগ্রেস কোনও গোষ্ঠী বা কোনও সম্প্রদায়ের আধিপত্যে বিশ্বাস করে না। কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে যার বৃত্তে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, পার্সি, ইহুদি - এই বিশাল দেশে বসবাসকারী প্রতিটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি রয়েছে এই দেশের লাখ লাখ মুসলমান হিন্দু উৎস থেকে এসেছে। তাদের জন্মভূমি ভারত ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কিভাবে ? সাভারকর এবং তার অনুগামীরা, এবং ভগৎ সিং-এর মতো বিপ্লবীরা যারা কখনও ক্ষমা না চাওয়ায়, মৃত্যু সহ সমস্ত শাস্তি ভোগ করা বেছে নেওয়ার জন্য গর্বিত বোধ করেছিল, তাদের মধ্যে কী প্রবল ফারাক আছে এটা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিন থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ বিরোধী কাজ করার জন্য সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব গ্রহণ করার, বিচারের মুখোমুখি হওয়ার, জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যগুলিকে আরও প্রচারের জন্য বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করার এবং তারপর স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড, নির্বাসন বা এমনকি মৃত্যুকে শাস্তি হিসাবে গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিল।

এটি লক্ষণীয় যে সাভারকরের বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার এবং ভাল আচরণের প্রস্তাব দেওয়ার অভ্যাসটি ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ কারাগার থেকে তার মুক্তির সাথে শেষ হয়নি।গান্ধীজির হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮-এ, তিনি আর্থার রোড কারাগার থেকে পুলিশ কমিশনারের কাছে একটি প্রতিনিধিত্ব পাঠান এবং 'সরকারকে একটি অঙ্গীকার দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে খ (তিনি) সরকার চাইলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। যদি তাকে সেই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়'। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারকের জন্যেও এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে যে এটিও গান্ধীজীর পরামর্শে হয়েছিল, যদি না অবশ্যই উভয়ের মধ্যে এতটা শক্তিশালী বন্ধন ছিল যে নাস্তিক সাভারকার গান্ধীজীর আত্মার সাথে যোগাযোগের দাবি করতে পারেন! ❐

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাষণের তাৎপর্য

সৌর বসু

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাপিটল হিল রোটুন্ডায় সোমবার ২০ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতি পূর্বে ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে তিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হারিসকে কে পরাজিত করে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হলেন। সুশাসক হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোন পরিচিতি আছে বলে জানা নেই। ট্রাম্পের পরিচয় অস্থির মতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্ষমতা লোভী, উগ্র জাতীয়তাবাদী , অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি হিসেবে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর ব্রত হচ্ছে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'। তাঁর এই ব্রত পালনের পথে কোন আইনগত বাধা কে তিনি বাধা বলে মনে করেন না। দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রপতি হিসাবে তারপর প্রারম্ভিক ভাষণে যে কথাগুলো বলেছেন সেখানেই এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

তিনি বলেছেন পানামা খালকে তিনি পুনরুদ্ধার করে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে তিনি ফোনালাপে ডেনমার্কের রাষ্ট্র প্রধানকে বলেছেন গ্রিনল্যান্ড তাদের দিয়ে দিতে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কানাডাকে ৫১ তম রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করার। এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন যে বাধা স্বরূপ সেটা তার কাছে বিবেচ্য নয়। উগ্র জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি অভিবাসীদের তাদের নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রথম দফায় রাষ্ট্রপতি থাকাকীলীন মেক্সিকোর নাগরিকদের আমেরিকায় অনুপ্রবেশে বাধা দেবার জন্য সীমান্ত বরাবর পাঁচিল তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। যদিও সে কাজ অমীমাংসিত থেকে গেছে।

ট্রাম্প দ্বিতীয় দফার শপথ গ্রহণের প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন যে আমেরিকায় জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রদানের যে নিয়ম রয়েছে তা তিনি পরিবর্তন করবেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্তে জরুরি অবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে দক্ষিণ সীমান্তে সৈন্য পাঠানো হতে পারে।

দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নির্দেশগুলি জারি করেছেন তার মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা খুব স্পষ্ট। তিনি নিজেকে গণতন্ত্রের পূজারী বলে অভিহিত করছেন। তিনি মনে করেন আমেরিকার আর্থ সামাজিক অবস্থা অবনতির পথে চলেছে। আমেরিকার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার সংকল্পের কথা তিনি উদ্বোধনী মঞ্চে ঘোষণা করেন । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিডেনকে আমেরিকার বর্তমান দুরাবস্থার জন্য তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করতে তার রুচি বোধে বাধেনি।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে ইউরোপে কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থার পতনের পর ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা এই ঘটনাকে বলেছিলেন 'এন্ড অফ হিস্ট্রি'। সেই সঙ্গে তিনি বাজার অর্থনীতি এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। আজকে

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট' আন্দোলনকে অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ 'End of Progress' বলে অভিহিত করে বলেছেন, ফুকোয়ামার ভবিষ্যৎবাণী সর্বৈব ভুল ছিল। প্রকৃতপক্ষে স্টিগলিৎস মনে করেন আমেরিকায় এখন oligarchy বিদ্যমান , গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার শপথ অনুষ্ঠানে যারা মঞ্চে বসেছিলেন, তারা আমেরিকার প্রযুক্তি এবং শিল্প বাণিজ্যের প্রধান মুখ। টেস্টলারের এলেন মাস্ক, অ্যামাজনেরজেফ বেজোস , অ্যাপেলের টিম কুক, জুকারবার্গ গুগলের সুন্দর পিচাই প্রমুখ। এরা আমেরিকার সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ডোনাল্ড ট্রাম্প পরবর্তী চার বছরে আমেরিকার স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত করবে। স্বাভাবিকভাবেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যাবর্তনের কারণে আমেরিকার সর্বাপেক্ষা ধনী সম্প্রদায় আহ্লাদিত।

জোসেফ স্টিগলিৎজ বলেছেন আমেরিকায় একাডেমিক ফ্রিডম বা শিক্ষাঙ্গনে মুক্ত চিন্তার পরিসর হ্রাস পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের বিজ্ঞানের বই থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকার ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। ক্রীতদাস প্রথা বা আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাদের উপর নির্যাতনের ইতিহাস কে চেপে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। বস্তুতপক্ষে অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ বলতে চেয়েছেন আমেরিকায় গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানকে অবমাননা করা হচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া চলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার পারিষদবর্গ তাকে উপেক্ষা করছে । প্যারিসের জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তি থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে জ্বালানি সরবরাহ করতে চান। তার প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বলেছেন ড্রিল বেবি ড্রিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু যা তিনি বলেননি সেগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। আমেরিকায় যে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক শ্রেণী রয়েছে, তাদের বিষয়ে তিনি কোন কথা উচ্চারণ করেননি।

আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থা যে ভেঙে পড়ছে সে সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রারম্ভিক ভাষণে প্রকাশ পায়নি।। আমেরিকার চিকিৎসকদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধের দাম অন্যান্য দেশের থেকে বেশ বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ১০ গুন বেশি। সে সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ তাঁর বক্তৃতায় ছিল না। আমেরিকার ২৫ শতাংশ মানুষের ,চিকিৎসকদের প্রেসক্রাইব করা ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই, সে ব্যাপারে কোনও উৎকণ্ঠা তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ পায়নি। আমেরিকায় ৮ লক্ষেরও বেশি মানুষের কোন বাসস্থান নেই। দরিদ্র মানুষেরা তাদের সীমিত আয়ের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বাসস্থানের পিছনে ব্যয় করেন।

আমেরিকায় বাসস্থানের সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদের বাসস্থানের জন্য কোনও নতুন প্রকল্পের কথা তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে উল্লেখ করেননি। আমেরিকায় আর্থিক বৈষম্য দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমেরিকার তিনজন ধনী মানুষের সম্পদের পরিমাণ, নিচু তলার পঞ্চাশ শতাংশ দরিদ্র মানুষের থেকে বেশি। আমেরিকার সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তার উদ্বোধনী ভাষণের মঞ্চে, তার পাশেই উপস্থিত ছিলেন। এই কতিপয় ধনী ব্যক্তির সম্পদ বিগত নভেম্বর ২০২৪ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত ২৩৩ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা কাদের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তার ফলে কারা উপকৃত হবে, তার ইঙ্গিত এখানেই পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হিমাচল প্রদেশ যে আজ আক্রান্ত, সে বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি প্রারম্ভিক বক্তৃতায়। প্যারিসের জলবায়ু চুক্তি থেকে তিনি স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তার ব্রত হচ্ছে ড্রিল বেবি ড্রিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প সমস্ত বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। অথচ তিনি তার প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করে নিজের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে চাইছেন। দেশের অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধি করতে চাইছেন। তার মেক আমেরিকা গ্রেট প্রকল্পের জন্য তিনি পৃথিবীজুড়ে ট্যারিফ বা শুল্কের পাঁচিল তুলতে চাইছেন। শুল্কের পাঁচিল তোলার অর্থ, অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ থেকে অন্য রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করা।

অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ স্বাভাবিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে আমেরিকার গণতন্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে আমেরিকায় OLIGARCHY প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ❐

হামাস-ইজরায়েল গাজা সমঝোতা

মনিরুল হক

আমরা দেখে আসছি, বিগত ১৫ মাস ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রধান প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হামাস ও ইজরায়েল রাষ্ট্রের মধ্যে ঘটে চলেছে এক তীব্র সংঘর্ষ। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে গাজা ভূখন্ডের ধ্বংসযজ্ঞ সমাপনের শেষে ঘোষণা করা হল যে, যুদ্ধের দুইটি পক্ষ ইজরায়েল ও হামাস যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এক সমঝোতাপত্র মেনে নিতে রাজি হয়েছে। রাজনৈতিক পরিভাষায় একে শান্তিচুক্তি বলা হলেও বাস্তবে এই চুক্তি হল একটি রাজনৈতিক প্রহসনের অতি দীর্ঘ ও অবিন্যস্ত এক চিত্রনাট্য যা আগামী দিনগুলিতে আমাদের সামনে অভিনীত হতে থাকবে। আপাততঃ গোলাগুলি বন্ধ হলেও এই চিত্রনাট্যের পরের দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাব, গাজার মানুষের জন্য রচিত হয়ে আছে চরম দুর্দশার এক নতুন অধ্যায়।

আমাদের মনে আছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে গাজার প্রশাসনিক কতৃত্ব যাদের হাতে ছিল, সেই হামাস অতর্কিতে হামলা চালায় ইজরায়েলে। সেই হামলায় তারা ১১৯৫ জন মানুষকে হত্যা করে এবং ২৫১ জন মানুষকে বন্দী করে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে আসে। হামাসের এই প্রত্যক্ষ হামলা গাজা অঞ্চলে তথা ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণ শানানোর এক অযাচিত সুযোগ এনে দেয় ইজরায়েলের কাছে।

বিগত ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে তারা হামাস ও তার সহযোগী হিজবুল্লার সামরিক শক্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করার সাথে সাথে প্রায় ২৫ লক্ষ সাধারণ ফিলিস্তিনিদের জীবন, জমি, সম্পত্তি একেবারে ছারখার করে দিয়েছে। ইজরায়েল বাহিনীর প্রত্যক্ষ আক্রমণে খুন হয়েছেন ৪৯ হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি কিন্তু পরোক্ষভাবে মৃত্যু হয়েছে তার বহুগুন, যার মধ্যে শিশু ও মহিলার সংখ্যা অর্ধের বেশি। নিখোঁজ আছেন প্রায় ১০ হাজার মানুষ। বন্দী হয়েছেন ৩০ হাজার মানুষ। বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, অফিস-কাছারি ধ্বংস হয়েছে ৯০ শতাংশের বেশি। গৃহহারা হয়েছে প্রায় সমস্ত মানুষ। জমজমাট, কোলাহলমুখর আধুনিক গাজা অঞ্চল এখন বিশাল এক ধ্বংসস্তুপ। সেই প্রেতনগরীর নতুন পাহারাদারের নাম মৃত্যু।

হামাসের শক্তি ছিল সীমিত। তাই হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষ আসলে ছিল একপেশে এক ধারাবাহিক আক্রমণ। বাকি পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করল ধ্বংসযজ্ঞ, নৃশংসতা আর মৃত্যুর মিছিল। সঙ্গত কারণেই সংঘর্ষ শুরুর প্রথম থেকেই সারা পৃথিবীর মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন ইজরায়েলের এই একতরফা ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে। তাতে সামিল হয়েছেন ইজরায়েলের সাধারণ মানুষও। ইউরোপের দেশগুলিও, এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত বারবার ইজরায়েলকে এই একতরফা যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছে কিন্তু ইজরায়েল সে সব কথায় কর্ণপাত করেনি। তার কারণ হল তাদের মুরুব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত এবং হামাস সহ আরব দেশগুলির আত্মঘাতী অবস্থান। ফিলিস্তিনিয় মুসলিমদের প্রতি ইজরায়েল রাষ্ট্রের নীতি হল- প্যালেস্টাইন নয়, ইজরায়েল রাষ্ট্রকে মেনে নাও এবং তার শাসনে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন কর। নিজভূমে উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ইজরায়েল রাষ্ট্রকে ফিলিস্তিনিরা কখনও মেনে নেয় নি। তাঁরা চেয়েছিলেন দখলদারবিহীন স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র। তাঁদের আদি সংগঠন পি এল ও দীর্ঘ লড়াই করে ফিলিস্তিনিয়দের দাবির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিল এবং জাতিসংঘের স্বীকৃতিও আদায় করেছিল। কিন্তু ইজরায়েলের ক্রমাগত অসহযোগিতা ও ফিলিস্তিনিয়দের হতাশাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় নতুন সংগঠন হামাস। তারা ইজারায়েলের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় লাভের নীতিতে বিশ্বাসী। এই সংঘর্ষ, এই নৃশংসতা তাই ছিল অনিবার্য সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই মিশর ও জর্ডন বিভিন্ন মহলে কথা বলে যাচ্ছিল যাতে করে এই যুদ্ধ বন্ধ করা যায়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য উদ্যোগী হতে বাধ্য হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে ৪ দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রেখে হামাস ও ইজরায়েল কয়েকজন বন্দী বিনিময়ও করেছিল। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে মিশর যুদ্ধ বন্ধের নতুন এক প্রস্তাব পেশ করে কিন্তু তা নিয়ে অগ্রগতি হয়নি।

২০২৪ সালের মার্চ মাসে প্রথমবারের মত হামাস ও ইজরায়েল মুখোমুখি বসে আলোচনার জন্য, কিন্তু অচলাবস্থা কাটেনি। দীর্ঘসূত্রতা অব্যহত ছিল। এর পর ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে চুক্তি রূপায়নে গতি আসে।

গত ১৭ জানুয়ারী জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয়ের প্রতিনিধি এবং মিশর ও কাতারের সহযোগীতায় যে সমঝোতাপত্র তৈরি হয় তা ইজরায়েল ও হামাস উভয়পক্ষ মেনে নেয়। প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির রূপরেখাটা সংক্ষেপে এইরকম- চুক্তিটি রূপায়িত হবে তিন ধাপে। প্রত্যেকটি ধাপের সময়সীমা থাকবে ৪২ দিন।

প্রথম ধাপে ক্ষেপে ক্ষেপে হামাস ৩৩ জন ইজরায়েলী বন্দীকে ছেড়ে দেবে এবং ইজরায়েল ছেড়ে দেবে ১৯০৪ জন বন্দী কে। ইজরায়েল গাজার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করবে। গাজার অধিবাসীরা বিনা বাধায় নিজভূমে ফিরে যাবে। প্রত্যেক দিন ৬০০ ট্রাক ত্রাণ নিয়ে গাজায় ঢুকরে পারবে এবং আরও ৫০ টি ট্রাক ঢুকবে জ্বালানি নিয়ে।

দ্বিতীয় ধাপে স্থায়ী যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আলোচনা হবে। উভয় তরফে বন্দীদের মুক্ত করার কাজ চলবে। হামাস সমস্ত ইজরায়েলি বন্দীকে ছেড়ে দেবে। তৃতীয় ধাপে উভয় পক্ষ শবদেহ বিনিময় করবে। ইজরায়েলের গাজা থেকে অবরোধ তুলে নেবে তবে হামাস তার সামরিক শক্তি পুনর্গঠন করতে পারবে না।

হামাসের সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনির জীবন ও পরিবারের পুনর্গঠন। আশার কথা, প্রাথমিক জটিলতা কাটিয়ে চুক্তি মেনে উভয় পক্ষই বন্দীদের ছাড়তে শুরু করেছে। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি নিজভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন। বাড়ির দিকে ফেরা মানুষেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁরা ভিটেমাটি ছাড়বেন না। তাঁরা আবার গড়ে তুলবেন তাঁদের বাড়িঘর, চাষ করবেন ক্ষেত-খামার। কিন্তু বিষয়টা যথেষ্ট কঠিন। শুধু নিজেদের শ্রম আর ইচ্ছে দিয়েই সব কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। সামনে চলে আসবে নতুন নতুন প্রতিপক্ষ। উদয় হয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গাজার মাটির দিকে তাকিয়ে তাঁর জিব লক্ লক্ করে উঠছে। তিনি বলেছেন- GAZA IS INTERESTING. IT (A PHENOMENAL LOCATION– ON THE SEA. THE BEST WEATHER– YOU KNOW– EVERYTHING IS GOOD. IT) LIKE SOME BEAUTIFUL THINGS COULD BE DONE WITH IT... GAZA REALLY GOT TO BE REBUILT IN A DIFFERENT WAY. তাঁর প্রাথমিক ভাবনা, গাজাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে গেলে তার প্রায় ২৫ লক্ষ অধিবাসীকে দেশ থেকে সরিয়ে মিশর, জর্ডন ও অন্যান্য আরব দেশে স্থানান্তরিত করতে হবে আর এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সাথে কথা বলবেন। অর্থাৎ গাজার মানুষজন নয়, গাজার বিস্তীর্ণ ভূ-অঞ্চলই তাঁর লক্ষ্যবস্তু।

এদিকে আবার হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইজরায়েলের অস্ত্রভান্ডারে টান পড়েছে তাই তিনি ২০০০ পাউন্ড ওজনের বোমা ইজরায়েলকে সরবরাহ করার ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছেন যা বাইডেন সরকার আটকে রেখেছিলেন।

তাই আক্রমণ আপাতত থামলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইজরায়েলের পাশে 'IN A DIFFERENT WAR' আরও শক্ত ভাবে দাঁড়াবে, গাজাবাসীকে আরও কঠিন কোন শত্রু পক্ষের মোকাবেলা করে হবে তা নিয়ে দ্বিমত পোষন করার কোন জায়গা নেই। বিশ্ব জনমতের প্রবল চাপে INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অনেকদিন আগেই যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে রেখেছে। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই পরোয়ানাকে সমর্থন করেছে। কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শুধু জো বাইডেনই একঘরে হয়ে নেতানিয়াহুর পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নেতানিয়াহুর পরিত্রাণে আরও দু'কদম এগিতে আসবেন একথা জলের মত পরিস্কার। গাজাকে 'CLEAN OUT' করার নাম করে অথবা অন্য কোন অজুহাতে নতুন করে কোন আক্রমণ তারা নামিয়ে আনতে পারে ফিলিস্তিনিদের উপরে। আমরা যেন ভুলে না যাই, প্যালেস্টাইনকে নস্যাৎ করে গাজা, ওয়েষ্টব্যাঙ্ক এবং আন্যান্য আরব রাষ্ট্রের অংশ নিয়ে এক বৃহত্তর ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে ইজরায়েলি যুদ্ধবাজরা। ❐

দূষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফসল আরজিকর কাণ্ড

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

মানুষ আশা করেছিল, সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি হবে, কারণ এটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। কিন্তু কোর্টে সিবিআই এর পেশ করা তথ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করে বিচারক সঞ্জয়কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। বিচারের রায়দানে শিয়ালদহ কোর্টের বিচারক তাঁর ১৭২ পাতার রায়ে বারবার বলেছেন, তিনি যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন সিবিআই এর কাছ থেকে, তার ভিত্তিতেই তাঁর এই রায়দান করতে হচ্ছে। রায়দানে তিনি তদন্তের বিভিন্ন জায়গায় ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখও করেছেন। তিলোত্তমার বিচারের ঘটনায় দেখা গেল, যে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ, মাঝপথে তা চলে গেল সিবিআই-এর হাতে। সিবিআই ভারতের সর্বোচ্চ পুলিশি তদন্তকারী দপ্তর। ফলে সিবিআই বিচারপতির কাছে যেভাবে তথ্য-প্রমাণ পেশ করছে, বিচারপতিকে সেই ভাবেই বিচার করতে হয়েছে।

আরজি কর-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে যেভাবে প্রবল গণপ্রতিরোধ রাস্তায় নেমে এসেছিল, তা এককথায় অভূতপূর্ব। প্রত্যেকেরই একটা প্রত্যাশা ছিল যে, অন্তত এই নারকীয় ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক পথে তদন্ত হবে। তদন্তের পর বিচার প্রক্রিয়াও দ্রুত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। কিন্তু সমস্ত প্রত্যাশাতেই জল ঢেলে একটি তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়ে বিচারের বাণী প্রকাশিত হলো। এখানে বলা দরকার, সমস্ত ভারতজুড়ে যে অপরাধ জগৎ এখন তৈরি হয়েছে, স্বাধীনতার পরে ভারতের বুকে এত বড় অপরাধ জগৎ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আর কখনো গড়ে ওঠেনি। আমাদের রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সেটি গড়ে উঠেছে। ফলে অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই তদন্ত প্রক্রিয়া এবং বিচার প্রক্রিয়া; উভয়কেই প্রায় একটি তামাশায় পর্যবসিত করেছে। তদন্তকারীরা অপরাধ জগতের লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যতটুকু তদন্তের প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই করেন। আর বিচার ব্যবস্থার কাছে তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেটুকু তথ্য রেখেঢেকে উঠে আসে, বিচার ব্যবস্থা ঠিক সেটুকুর ওপর দাঁড়িয়েই তাদের কাজটি সারে। ফলে আজকের দিনে ভারতের বুকে কোনরকম অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং এই তদন্তের ভিত্তিতে বিচারের বাণী তামাশায় পরিণত হয়েছে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ বিচার নেই, প্রকৃত তদন্তও নেই। সবটাই অপরাধ জগতের করায়ত্ব। এখান থেকে মুক্ত হবার একটি উপায়, যাঁরা অপরাধ জগতকে মদত দেন, তাঁদের চিহ্নিত করে সমূলে বিনাশ করা। অন্যথায় এই অপরাধ জগৎ ক্রমাগত অপরাধ করেই চলবে। তারপর লোক-দেখানো একটা তদন্ত হবে। তদন্তের নিট ফল হবে শূন্য। সর্বশেষে বিচার প্রক্রিয়াও একটি স্তরে এসে স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর ক্রমশ পুরো ঘটনাটি মানুষের স্মৃতিতে ফিকে হয়ে যাবে।

আরজিকর হাসপাতালের এক অভিশপ্ত রাত ৯ অগাস্ট, ২০২৪। সেখানে ঠিক কী ঘটেছিল, তা আজও মানুষের কাছে অমীমাংসিত। আর কারা এসব কাণ্ড ঘটিয়েছিল, তা নিয়ে মানুষের মনে বহু প্রশ্ন রয়ে গেছে। তবে ঘটনাটা যে ঘটেছিল, এটা বাস্তব। ঘটনাটা কী? পড়ুয়া ডাক্তার অভয়ার শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও নৃশংস খুন।

১০ আগস্ট, ২০২৪ সকাল থেকে নানান সংবাদমাধ্যম এবং দূরদর্শনের পর্দায় আসতে শুরু করল তিলোত্তমার নারকীয় এই ধর্ষণ ও খুনের সংবাদ। সমস্ত মানুষ এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আপামর মানুষের মধ্যে একটা গণজাগরণের স্ফুলিঙ্গ এর বিরুদ্ধে দানা বেঁধে ওঠে। বেশ কিছু অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রী রাস্তা অবরোধ করে বলল, অভ য়ার দেহের যথাযথ পোস্টমর্টেম ছাড়া দেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া যাবে না। ১০ তারিখ থেকেই কলকাতার রাজপথ উত্তাল হতে শুরু করল। ১১ তারিখ সকালে সমস্ত সংবাদপত্রে খবরটি ছাপা হলো। সমস্ত রকম গণমাধ্যমে এটি প্রচারিত হতে থাকলো।

এরপর শুরু হল এক নবজাগরণের পালা। স্বাধীনতার আগে পশ্চিমবঙ্গের বুকে মানুষ বহু আন্দোলন দেখেছেন। মানুষ দেখেছেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, যে আন্দোলনকে ঘিরে এক বিখ্যাত উক্তি রয়েছে; 'All changes changed utterly– a terrible beauty was born.' কিন্তু তিলোত্তমার মৃত্যুর পরে যে জাগরণ ঘটল, সেই গণঅভ্যুত্থানে মূলত শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ সামিল হলেন। প্রথমে কলকাতায় শুরু হয়ে ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের প্রতিটি শহরও এই নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠলো। এমনকি পৃথিবীর নানান প্রান্তে এর প্রতিবাদ দেখা গেল। সবাই একযোগে বলতে থাকলেন তিনটি শব্দ; উই, ওয়ান্ট, জাস্টিস।

এখানে একটা কথা এসে পড়ছে, এত যে সব ঘটনা ঘটলো, তা কি শুধুই আরজিকর কাণ্ডের জন্য? সম্ভবত তা নয়। কারণ এক দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের ওপর অত্যাচার এবং খুন দেখে আসছেন। মানুষ কামদুনিতেও নৃশংস খুন ও ধর্ষণের ঘটনা দেখেছেন, যেখানে যথাযথ ন্যায় বিচার পাওয়া যায়নি। সেখানে তদন্তে গাফিলতির জন্য বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত ছাড় পেয়ে গিয়েছে।

তিলোত্তমার মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যেভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো, সেখানে প্রথম দেখা গেল যে, সামগ্রিকভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা। অবশ্য আন্দোলনে মহিলাদের নেতৃত্বদানের বিষয়টি নতুন কোন ঘটনা নয়। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে মহিলাদের ভূমিকা এবং মাতঙ্গিনী হাজরার কথা আমাদের সকলের মনে আছে। কিন্তু এই আন্দোলনে দেখা গেল, বাড়ির যেসব মা-বোনেরা কোনদিনও কোন কারণেই পথে নামেননি, তাঁরাও কিন্তু এই প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হলেন। ছাত্র আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি নানা ধরনের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বুকে নতুন কোন ঘটনা নয়। বিভিন্ন সময়ে এ সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে কলকাতার রাজপথ উত্তাল হয়েছে। সেই আন্দোলনে জের ধরে অনেক সময় হিংসাও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অভয়ার মৃত্যুর পরের যে আন্দোলন, তা একেবারে অহিংসই থাকলো। আন্দোলনকারীদের হাতে কোন বাস, ট্রাম বা ট্রেন কিছু পুড়লো না। মোমবাতি হাতে কয়েক লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় নামলেন। রাজ্যজুড়ে মহিলারা রাস্তা দখল করে রাত জাগলেন। এ এক অভিনব আন্দোলন প্রক্রিয়া।

এই আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আদালতের দরজাতেও। কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হল। মামলাতে যেসব কেস ডায়েরি রাখা হলো, সেগুলো দেখে মাননীয় প্রধান বিচারপতি রাজ্য সরকারকে বললেন, 'আপনারা যেভাবে কেস ডায়েরি সাজিয়েছেন এবং যেভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে, তাতে অনেক কিছু খামতি রয়ে যাচ্ছে। এতে সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটিত হবে না। তাই আপনাদের উপর আর ভরসা না রাখতে না পেরে এই তদন্তভার আমি সিবিআইকে দিলাম।' তিনি নির্দেশ দিলেন, সিবিআইকে বিকেল চারটের মধ্যে তদন্তের সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে। ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অভয়ার নৃশংস খুন ও ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার করেছে। যদিও বারবার বিভিন্ন রকম সংবাদমাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, কীভাবে সমস্ত প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে এবং একজন নয়, বেশ কয়েকজন এই নৃশংস কাণ্ড ঘটানোর পেছনে দায়ী।

সবচেয়ে অবাক করা কাণ্ড হলো, অভয়ার মৃতদেহ দাহ করার সময় যিনি স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁদের পরিবারের কোনো আত্মীয়-ই নন। অভয়ার ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ ছিল যে, রাত সাড়ে বারোটার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অভয়ার মৃত্যু সংবাদ তাঁর পিতামাতাকে দেওয়ার সময় প্রথমে বলা হয়েছিল যে, এটি আত্মহত্যা। পরে ধর্ষণ ও খুনের সংবাদটি জানিয়ে তাঁদের আসতে বলা হলো আরজিকর হাসপাতালে। তিন ঘণ্টা নানাভাবে কলকাতার পুলিশ ও প্রশাসন তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তাঁদের মেয়ের দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। অথচ অসংখ্য লোক যেখানে অভয়ার দেহ পড়েছিল সেখানে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পোস্ট মর্টেম হল সন্ধ্যার সময়। অতি দ্রুত তৎপরতায় অভয়ার মৃতদেহ দাহ করা হলো। অভয়ার মৃত্যুজনিত নানান তথ্যে বিভিন্ন অসংগতি ক্রমাগত দেখা গেল। শুরু থেকেই ধোঁয়াশা সৃষ্টি হল। চারদিন পরেই যেখানে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল সেখানে দেওয়াল ভেঙে মেরামতির কাজ শুরু হল। আর ১৪ আগষ্ট এক বিরাট উশৃঙ্খল জনতা এসে আর. জি .কর হাসপাতালে ব্যাপক ভাংচুর চালালো। নজর ছিল সি.সি.টিভি'র কন্ট্রোল রুমের ওপর।পুলিশ ছিল নির্বাক দর্শক।

কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের-এর ঘটনাটির উপরে সমস্ত ভারতবাসীকে চমকে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই কেসটিকে নিজের হাতে নিল। সুপ্রিম কোর্ট জানালো, তারা দেখবে যে কীভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটল এবং এর তদন্ত প্রক্রিয়াই বা কীভাবে চলবে। অভয়ার এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সকল মানুষ

পথে নেমেছিলেন, তাঁরা সুপ্রিম এই বচনে খানিকটা আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হলেন বইকি। যখন রাজ্য থেকে বারবার বলা হলো যে, এক্ষুণি এই বিষয়টিতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই, তখন সুপ্রিম কোর্ট এর প্রধান বিচারপতি বললেন, 'আমি আর একটা ধর্ষণ ও খুনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।' ভারতবর্ষের বুকে যত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও নার্সিংহোম আছে, তাদের সুরক্ষাদানের জন্য তিনি একটি কমিটি গড়ার নির্দেশ দিলেন। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্রমাগত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে এবং তাঁদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রাজ্য প্রশাসনকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সিকিউরিটি বাড়ানো এবং সিসিটিভি লাগানো ইত্যাদি নানান কাজ করতে হবে।

এখানে একথাও বলা দরকার যে, বিগত প্রায় এক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছেন যে, অসংখ্য কেস সিবিআই এর হাতে গেছে। কিন্তু তার কোন সমাধান তো দূরের কথা এখনো চার্জশিট পর্যন্ত হয়নি। অভয়ার নৃশংস খুন ও ধর্ষণের তদন্তভার সিবিআই হাতে নেওয়ার পর আরজিকর কলেজের অধ্যক্ষকে কয়েকদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করলো। আরেকটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা ঘটলো, যে টালা পার্ক থানার অধীনে আরজিকর মেডিকেল কলেজ অবস্থিত, সেই থানার ওসিকেও সিবিআই গ্রেপ্তার করলো। আইনি জগতে এটা অত্যন্ত বিরল দৃশ্য যেখানে কোনও থানার ওসিকে প্রমাণ লোপাট ও তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো।

এরপর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলো। প্রতিদিনই মানুষ ভাবেন যে, আজকে নিশ্চিতভাবে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সুবিচার হবে। তাঁরা উদগ্রীব হয়ে থাকেন শোনার জন্য সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির বক্তব্য। প্রধান বিচারপতি প্রতিবারই বলে যান যে, বিচার চলছে, তদন্ত প্রক্রিয়ায় আমরা কোন ঘাটতি দেখছি না। কিন্তু মানুষ জানতে পারছে না ঠিক কী ঘটছে। তিলোত্তমার পিতামাতাও এ ঘটনায় মোটেই খুশি হননি। তাঁদেরও বারবার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, খুনিরা কিছুতেই পার পাবে না। তাঁরা যেন একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন।

এই তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রধান বিচারপতি পাল্টে গেলেন। স্বাস্থকেন্দ্র, হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর কোন সুরক্ষা ব্যবস্থাই এখনো পর্যন্ত নজরে এলো না। একইসঙ্গে আরেকটি ঘটনাও একেবারে সামনে চলে এলো। সেটি হলো হাসপাতালের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীন দুর্নীতি। হাসপাতালের ওষুধে দুর্নীতি। পর্যাপ্ত পরিমাণে যে চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে দেখা গেল ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালে কর্মরত নারী-পুরুষদের ব্যবহারের আলাদা শৌচালায় পর্যন্ত নেই। চিকিৎসাজাত বর্জ্যের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই। বহুদিন ধরেই পরিবেশকর্মীরা বলে আসছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই এই চিকিৎসাজাত বর্জ্যের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা হয় না। কিন্তু তাতে কেউ কান দেয়নি। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। এ নিয়ে আগে নানান কমিটিও গড়া হয়েছে। আরজিকর হাসপাতালের চিকিৎসাজাত বর্জ্য বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠল। এমনকি ডাক্তারি পড়ুয়াদের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত মৃতদেহ এখানে আসে, সেগুলোকেও বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বস্তুত এমন একটা ক্ষেত্র পাওয়া গেল না, যেখানে দুর্নীতির কোন অভিযোগ নেই।

এমন অবস্থায় বিচার-পর্ব চলতে থাকলো। শিয়ালদহ কোর্টে বিচার চলছে। দেখা গেল, প্রায় সকলেই যেখানে বলছেন যে অভয়ার মৃত্যু ও ধর্ষণের জন্য একাধিক ব্যক্তি জড়িত, সেখানে একজন ছাড়া আর কারোর বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনা হলো না। প্রাথমিকভাবে যে চার্জশিট সিপিআই পেশ করল, তা দেখে সবাই প্রায় হতবাক হল। সকলের আশাভঙ্গ হল। চার্জশিটে বলা হল, কলকাতা পুলিশের সিভিক ভল্যান্টিয়ার একমাত্র সঞ্জয় ছাড়া আর কাউকে এখানে দোষী বলে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সবাই যেখানে বলছেন যে, নারকীয় এই হত্যাকাণ্ড একমাত্র সঞ্জয়ের পক্ষে ঘটানো কখনোই সম্ভব নয়, এখানে অন্য অনেকেই জড়িত, তাদের কারোর কোনও উল্লেখ চার্জশিটে পাওয়া গেল না। আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, টালা থানার যে ওসিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁকেও ছেড়ে দেওয়া হল। চার্জশিটে তাঁর নামই থাকল না। তখনই মানুষ কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, আড়ালে কোথাও একটা কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ঘটনা যে কী ভয়ংকর আকার নিচ্ছে, তা মানুষ কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারলেন।

এই আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিচারপতি পাল্টে গেছেন। আইনজীবীরাও পাল্টেছেন। তবুও মানুষের একটা আশা ছিল, সদর্থক কোনও রায় অবশ্যই আদালত দেবে। কিন্তু কিছুই হলো না। এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখার বিষয় হলো, বিচার ব্যবস্থা যখন কোন বিচার করতে শুরু করে, বিচারককে তখন তদন্তকারী আধিকারিকের দেওয়া তথ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে বিচার করতে হয়। সংশ্লিষ্ট তথ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করেই বিচারের রায়দান করতে হয়। বিচারপতিরাকখনোই তদন্ত প্রক্রিয়া বা অনুসন্ধানের কোন অংশ হতে পারেন না। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরাই একমাত্র এই অনুসন্ধানের অংশ হতে পারেন।

এর আগেও গঙ্গা দূষণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, কোথায় কোথায় দূষণ ঘটছে, তার একটি রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে পেশ করার জন্য। সেই ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী নির্দেশ দেবে। বিচারপতি কুলদীপ সিং নিজে এসে কিন্তু গঙ্গা দূষণের কোন অনুসন্ধান করেননি। রাজ্য সরকারের রিপোর্টগুলির ওপর ভরসা করেছিলেন। গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি সঠিক পথে এগোতে পেরেছিলেন এই কারণেই যে, বেশ কিছু রাজ্য সরকার দূষণ নিয়ে যথাযথ রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে পেশ করেছিল। এমনকি এ ঘটনাও ঘটেছে, যেখানে বিচারপতি মনে করেছেন যে রাজ্য সরকার যথাযথ রিপোর্ট দিচ্ছে না, সেখানে তিনি অন্য কোন সংস্থার হাতে এই দায়ভারটি দিয়েছিলেন।

৯ অগাস্ট, ২০২৪ রাত থেকে শুরু করে বিচারের বাণী বেরোনোর এই যে ঘটনাপ্রবাহ, তা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই কিন্তু অত্যন্ত কলুষিত হয়ে রয়েছে। কলুষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি দুর্নীতিতে ডুবে থাকে, তাহলে কখনোই কোনভাবে এই সঠিক বিচার হতে পারে না। ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রের দিকে যদি চোখ মেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, এ সমস্ত জায়গাতেও এক নয়া ফ্যাসিজম চালু হয়েছে। সর্বত্রই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার প্রশাসন চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে নানান প্রলোভন দেখিয়ে তারা ভোটে জয়লাভ করছে। এই জয়লাভের মধ্য দিয়েই তারা তাদের অপরাধ জগতকে গড়ে তুলছে। এই অপরাধ জগতের মাথায় থাকছে সমস্ত শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এরাই পরিচালনা করছে সমস্ত তদন্ত কমিটিগুলোকে। ফলে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে বিচার ব্যবস্থা।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বালি চুরি, কয়লা চুরি, গরু পাচার ইত্যাদি যত মামলার তদন্ত সিবিআই করেছে, সেখানে কিন্তু কোন অপরাধেরই নিষ্পত্তি হচ্ছে না। দোষী সাজা পাচ্ছে না। কিছুদিন জেল খাটার পর জামিনে মুক্ত হয়ে আসছে। তদন্তকারীর সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা ক্রমাগত কিন্তু আক্রান্ত হয়েই চলেছে। এখানেই শেষ নয়। বিচারের বাণী বেরোবার পর দেখলাম, যাঁরা পথে নেমে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের শাসক দলের থ্রেট-এর মুখে পড়তে হলো। যে সমস্ত প্রতিবাদী শিল্পী রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বয়কট করা হলো। আজও কিন্তু এই ফ্যাসিস্ট চরিত্র এক নয়া মোড়কে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে, যেখানে দুর্নীতি , অত্যাচার , থ্রেট কালচার থাকবে। আবার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষকে নিজের দিকে টেনে এনে যেনতেন প্রকারে প্রশাসনিক ক্ষমতায় থাকতেই হবে। এক বড় অন্ধকারময় সময় আমাদের সামনে এসেছে।

তবে অভয়ার নৃশংস মৃত্যু ও ধর্ষণকাণ্ডের পরে এটা ভীষণ স্পষ্ট হলো যে, মানুষ কিন্তু দুর্নীতি অপরাধ দেখলে পথে নামতে পারে। কিন্তু পথে নামার পরেও সেই আন্দোলনের ঝাঁজ বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে। আন্দোলনের অভিমুখ যেন কোন এক কানাগলিতে হারিয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দুর্নীতির অবসান ঘটাতে এই হারিয়ে যাওয়া আন্দোলনকে আবার তার স্বমহিমায় ফেরানো অত্যন্ত জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিচারপতিদের বিচারও কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণই করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কিন্তু বিচার ব্যবস্থা একটা সময় বাধ্য হবে ন্যায়বিচার দিতে। বিচার ব্যবস্থা যখন বুঝবে যে, এই তদন্তকারী আধিকারিকদের যারা পরিচালিত করছে, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারাই অপসারিত হয়ে যেতে পারে, তখন তার এক উজ্জ্বল প্রভাব বিচার ব্যবস্থাতে দেখা দেবে। এটা ঠিকই যে, ভারতের বিচার ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। বহু মানুষের অধিকারকে এই বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার এই বিচারব্যবস্থাতে ধর্মীয় প্রভাব কিছুটা হলেও পড়ছে। যেসব ন্যায়বিচার আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তা যথাযথ হচ্ছে না। তবুও বেঁচে থাকে আশা। ❐

নেতাজি ও নজরুল
এক বৃন্তে দুটি কুসুম

মজিবুর রহমান

উনবিংশ শতাধীর শেষ লগ্নের দুই ক্ষণজন্মা বাঙালি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু (জন্ম- ২৩.১.১৮৯৭) ও কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম- ২৪.৫-১৮৯৯)। বয়সের দিক থেকে তাঁরা একেবারে সমসাময়িক ছিলেন। মাত্র দুই বছর চার মাসের ছোট বড়। দুজনেরই সক্রিয় কর্মজীবন স্বল্পসময়ের। ২২ থেকে ২৩ বছর। আড়াই দশকের কম সময়ের কর্মজীবনে সাফল্যের সুবাদে তাঁরা আপামর বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তাঁদের পরিচিতি অখণ্ড ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজি' ও নজরুলের 'বিদ্রোহী কবি' উপাধি তাঁদের প্রতি মানুষের ভালোবাসার স্মৃতি বহন করছে। বাঙালির কাছে এই ভালোবাসাই আবেগে পরিণত হয়েছে। সুভাষপ্রেমী ও নজরুলপ্রেমী কিছু মানুষের মধ্যে তাঁদের নিয়ে যে 'পাগলামি' লক্ষ্য করা যায় তা অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালির ক্ষেত্রে বোধহয় ঘটে না।

রাজনীতির সুভাষচন্দ্র সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন আর সাহিত্যের নজরুল রীতিমতো রাজনীতি সচেতন ছিলেন। এজন্য তাঁরা একে অপরকে ভালোই চিনতেন জানতেন। একে অপরের কার্যক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলও ছিলেন। সুভাষচন্দ্র কলকাতার মানুষ। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সিভিল সার্ভিসেস থেকে পদত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগদান করেন। কলকাতাই হয় তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। অন্যদিকে, হাবিলদার নজরুল সৈনিক জীবন শেষ করে করাচি থেকে ফিরে সাহিত্যকর্মকেই ধ্যানজ্ঞান করেন। ১৯২০ সালের এপ্রিল থেকে 'বাউণ্ডুলে' নজরুলের অন্যতম বাসস্থান ছিল বাংলার রাজধানী কলকাতা। বিশ-বাইশ বছর নেতাজি ও নজরুল একই শহরে বসবাস করেছেন। তাঁদের মধ্যে একাধিকবার দেখা হয়েছে , কথা হয়েছে।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায়। ওই অধিবেশন উপলক্ষে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় তার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন সুভাষচন্দ্র। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অধিবেশনে গেয়েছিল নজরুলগীতি 'চল চল চল/ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার আলবার্ট হলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। বক্তৃতা করেন জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি বলেন, 'স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে, আমাদের দেশে তা নেই।... নজরুলকে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক হতে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা দিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করেছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব লিখেছেন তিনি। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম, অন্য স্বাধীন

দেশে খুব বেশি। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল জীয়ন্ত মানুষ।' স্বাধীনতা সংগ্রামে নজরুল রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, ক্ষ্মআমরা যখন যুদ্ধে যাবো তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো তখনও তার গান গাইব।ক্ষ্ম সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে নজরুল গেয়ে শোনান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। তাঁদের পারস্পরিক সখ্যতার সুবাদে নজরুল এলগিন রোড ও উডবার্ন পার্কের বসু পরিবারের আড্ডায় গান শোনাতেন। কাজী নজরুল ইসলাম 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯২২ সালের নভেম্বরে কারারুদ্ধ হন। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি হিসেবে আসেন ১৯২৩ সালের ১৮ জুন। মুক্তি পান ১৫ ডিসেম্বর। সুভাষচন্দ্র প্রথমবার কারাবরণ করেন ১৯২৩ সালে। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন ৩.১২.১৯২৪ থেকে ২৫.১.১৯২৫ পর্যন্ত। এখনকার মানসিক হাসপাতাল তখন জেলখানা ছিল।

নেতাজি ও নজরুলের মধ্যে চিন্তাগত মিল ছিল লক্ষণীয়। তাঁরা দুজনেই মনে করতেন অহিংস পথে আবেদন নিবেদন করে কখনও স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। নজরুল ভারতের পরাধীনতার ইতিহাস স্মরণ করে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার- 'ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর!/উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পূনর্বার।' স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন নেতা সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বীরদর্পে অনুরূপ আহ্বান জানান- ' তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন তিনি। রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বামপন্থী। একইভাবে, নজরুল যেমন বিদ্রোহী কবি তেমনি সাম্যবাদী কবি হিসেবেও পরিচিত। তিনি সকল প্রকার অসাম্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে তথা সাম্যের সমর্থনে সোচ্চার ছিলেন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় রূপকের আড়ালে নয়, সরাসরি তিনি বলেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান'।

সুভাষচন্দ্র ষোলো আনা ধর্মনিরপেক্ষ নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের বিভেদকামী রাজনীতির বিরোধিতা করতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন কংগ্রেসের সদস্যদের কোনও ধর্মভিত্তিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যেও গভীরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। তিনি সৈনিকদের ধর্মভিত্তিক রান্নাঘর বন্ধ করে সকল সৈনিকের এক রন্ধনশালা চালু করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে রেখে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সকলের মিলেমিশে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের দেশে এটাই সঠিক ভাবনা। নজরুল এই ভাবনাকেই সাহিত্যে সুদৃঢ় করেছেন। মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'। তিনি হিন্দু আর মুসলমানকে পৃথক সত্তা হিসেবে দেখতে চাননি। চেয়েছেন অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব হিসেবে দেখতে, 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মোসলমান।/মুসলিম তার নয়ন মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।'

নারী জাতির প্রতি দৃষ্টভঙ্গিতেও নেতাজি ও নজরুলের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। 'অর্ধেক আকাশ'-এর অধিকার সুরক্ষিত রাখার পক্ষে ছিল তাঁদের অবস্থান। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান সুভাষচন্দ্র। তিনি মহিলাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি বাহিনী গঠন করেন এবং এর নাম দেন 'ঝাঁসির রানী ব্রিগেড'। নজরুল মনে করতেন মানব সভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কম নয়, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।' তিনি তাঁর 'নারী' কবিতায় দেখিয়েছেন, নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। বৈবাহিক জীবনেও সুভাষচন্দ্র ও নজরুলের কিছুটা মিল পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের প্রেমের পাত্রীকে সহধর্মিণী করতে কোনও ধর্মীয় বিধিনিষেধ অথবা সামাজিক সংস্কারের পরওয়া করেননি। সুভাষচন্দ্র তিরিশের দশকে অস্ট্রিয়ায় অবস্থানকালে অস্ট্রীয় খ্রিস্টান তরুণী এমিলি সাঙ্কেলকে তাঁর আপ্ত সহায়ক নিয়োগ করেন। পরে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের একমাত্র কন্যা সন্তানের নাম অনিতা বসু পাফ। নজরুল বিবাহ করেন ময়মনসিংহের আশালতা সেনগুপ্তকে। পরে নাম পাল্টে করা হয় প্রমীলা। কিন্তু তাঁরা কেউ কাউকে ধর্ম পরিবর্তনের জন্য চাপাচাপি করেননি। নজরুল ও প্রমীলার সন্তানদের নাম ছিল কৃষ্ণ মোহাম্মদ, অরিন্দম খালেদ (বুলবুল), সব্যসাচী ইসলাম ও অনিরুদ্ধ ইসলাম। অর্থাৎ, সন্তানদের নামকরণের ক্ষেত্রেও ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন নজরুল।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেতাজি ও নজরুল উভয়ের প্রতিই যথেষ্ট স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন আসেন। ১৯৩৯ সালের আগস্টে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই ভবনটির নামকরণ করেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক' আখ্যায় ভূষিত করে তাঁর নেতৃত্বদানের দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেন। তিনি তাঁর 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করে লেখেন, 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পূণ্য ব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।' তিনি নেতাজির সঙ্গে গান্ধীজির মতপার্থক্য মেটাতেও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে কলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্রের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। সুভাষচন্দ্রের বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসুকে একটি টেলিগ্রামে তিনি লেখেন, 'সুভাষের নিখোঁজ হওয়ার জন্য গভীরভাবে

উদ্বিগ্ন। অনুগ্রহ করে আমাকে খবর সম্পর্কে অবহিত করুন।' ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে নজরুল প্রকাশ করেন 'ধূমকেতু'। আন্তরিক আশীর্বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ, 'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু-- আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,/দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন/ জাগিয়ে দে রে চমক মেরে/ আছে যারা অর্ধচেতন।' ১৯২৩ সালে জানুয়ারিতে নজরুল যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। বিদ্রোহী কবি যখন হুগলি জেলে অনশন ধর্মঘট করছেন তখন উদ্বিগ্ন বিশ্বকবি শিলং থেকে তারবার্তা প্রেরণ করেন- 'অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করো। আমাদের সাহিত্যের তোমাকে প্রয়োজন রয়েছে।' নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ চৈ অত্যন্ত বেশি।... শুধুই হৈ চৈ আছে, কবিত্ব নেই' বলে যখন কেউ কেউ নজরুলের সমালোচনা করছেন তখন কবিগুরু তাঁর প্রিয় 'কাজী'র পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এসব তোমাদের আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন যে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজত।'

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে কলকাতা তথা দেশত্যাগ করেন জানুয়ারি, ১৯৪১। কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ ঘটে আগস্ট, ১৯৪১। কলকাতাতেই কাজী নজরুল ইসলাম নির্বাক হয়ে পড়েন জুলাই, ১৯৪২। কলকাতা তথা সমগ্র বাংলার জন্য সময়টা মোটেও ভালো ছিল না। তাঁদের দেখানো পথে বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্মাণ করার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। ❐

ইতিতহাসের পৃষ্ঠা থেকে
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি

সুভাষচন্দ্র বসু

(মহাত্মা গান্ধির ৭৫তম জন্মদিবসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই ভাষণটি দিয়েছিলেন। তখন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক। ইদানিং সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের এক অভিযান শুরু হয়েছে। নেতাজি গান্ধিজিকে জাতির জনক বলে সম্বোধন করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি ব্রিগেডের নামকরণ করেছিলেন গান্ধি ব্রিগেড ,জওহর ব্রিগেড ও আজাদ ব্রিগেড। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের ৭৮ তম বার্ষিকীর শহীদ দিবসে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায়আমরা নেতাজির এই বক্তৃতাটির সংক্ষিপ্ত অংশ পুনর্মুদ্রণ করলাম। সম্পাদক , নাগরিক।)

আজ সারা পৃথিবীতে ভারতীয়গণ তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধির ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করিতেছেন। এরূপ উপলক্ষেআমরাযাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করি, যাঁহার উদ্দ্যেশ্যে ভালোবাসা ও মর্যাদার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করা প্রথাসিদ্ধ। কিন্তু ভারতীয়গণ মহাত্মা গান্ধির জীবন ও কার্যাবলীর সহিত এত পরিচিত যে আমি যদি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে বসি তাহা হইলে তাঁহাদের বুদ্ধির প্রতি অমর্যাদা দেখানো হইবে। আমি তাহার পরিবর্তে ভারতেরস্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মাজীর স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিব। ভারতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধীর আচরিত সেবা এত বৈশিষ্টপূর্ণ ও অতুলনীয় যে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চিরদিনের মতো তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

.....কুড়িবৎসর কিংবা তাহারও অধিককাল ধরিয়া মহাত্মা গান্ধি ভারতের মুক্তির জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত কাজ করিয়া চলিয়াছেন ভারতীয় জনসাধারণও। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ১৯২০ সালে তিনি যদি তাঁহারআন্দোলনের অস্ত্রলইয়া না আসিতেন তাহা হইলে সম্ভবত আজও ভারত হতাশায় মুহ্যমান থাকিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সেবা অমূল্য ও অতুলনীয়। অনুরূপ অবস্থায় একটি মাত্র জীবনকালে একটি মাত্র ব্যক্তি ইহাঅপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্বঅর্জন করিতেপারেন না। বোধ হয় মহাত্মা গান্ধির সহিত নিকটতম ঐতিহাসিক সাদৃশ্য আছে মুস্তাফা কামালপাশার, যিনি বিগত বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কেরপরাজয়েরপর তাহাকেরক্ষা করেন এবং তাঁহাকে তুর্কীরা' গান্ধি'আখ্যা দিয়াছিলেন।

স্বাধীনতাঅর্জনেরপক্ষেঅপরিহার্য দুইটি পৃথক অনুশীলন ১৯২০ সাল হইতে ভারতীয়গণ মহাত্মা গান্ধির নিকট শিখিয়াছেন। তাঁহার প্রথম শিখিয়াছেন জাতীয়আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস, যাহারফলে তখন তাঁহাদের হৃদয়ে বৈপ্লবিক উদ্যম প্রজ্জ্বলিত হইয়াউঠিয়াছে। দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের এখন আছেদেশব্যাপী একটি সংগঠন যাহা ভারতের সুদূর গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত। এখন যখন স্বাধীনতারবাণী সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ও গোটা জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাদেরদেশব্যাপী একটিরাজনৈতিক সংগঠন আছে, এখন স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম, স্বাধীনতারশেষযুদ্ধের জন্য মহাসজ্জা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জাগরণের পথে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা একমাত্র ভারতেই হইয়াছে এমন নয়। ইটালিতে আন্দোলনে সর্বপ্রথম ম্যাটসিনি, ইটালির জনগণকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিয়াছিলেন। এমন কি যে যোদ্ধা ও বীর গ্যারিবল্ডি এক হাজার সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকের পুরোভাগে রোমের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে (ম্যাটসিনিকে) অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। আধুনিক আয়ারল্যান্ডেও ১৯০৬ সালে যখন সিনফিন পার্টির জন্ম হইয়াছিল তখন তাঁহারা আইরিশ জনগণকে যে কর্ম-পরিকল্পনা দিয়াছিলেন তাহা ছিল বহুলাংশে সদৃশ। সিনফিন পার্টির জন্মের দশবৎসরপরেঅর্থাৎ ১৯১৬ সালেআয়ারল্যাণ্ডে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতার সোজাপথে দৃঢ়ভাবে আমাদের পদস্থাপন করান, তিনি এবং অন্যান্য নেতারা এখন কারাগারে আবদ্ধ

রহিয়াছেন। সুতরাং, মহাত্মা গান্ধিযে কাজ আরম্ভ করেন তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবেস্বদেশ ও বিদেশস্থিত তাঁহার দেশবাসীদের। শেষ সংগ্রামের জন্য স্বদেশস্থিত ভারতীয়গণের সবইআছে, নাই শুধু একটি মুক্তিবাহিনী। সেই মুক্তিবাহিনী জোগাইতে হইবেবাহির হইতে এবং একমাত্রবাহির হইতেই তাহা করা সম্ভব।

আমি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাইযে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধি যখন নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহার অসহযোগ কর্ম-পরিকল্পনা সুপারিশ করেন তখন তিনি বলেন 'ভারতের আজ যদি তরবারি থাকিত তবে সে তাহা কোষমুক্ত করিত।' তাঁহার যুক্তিতে আরও অগ্রসর হইয়া মহাত্মা গান্ধি তখন বলিয়াছিলেন সশস্ত্র বিপ্লব যখন প্রশ্ন-বহির্ভূত, তখন দেশের সম্মুখে একমাত্রপথ অসহযোগ কিংবা সত্যাগ্রহ। তাহারপর হইতে দিন বদলাইয়াছে এবং এখন ভারতীয় মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এজন্য আমরা সুখী ও গর্বিত। একদিকে আমাদের কাজ হইতেছে এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রণাঙ্গনে পাঠানো , একই সঙ্গে আমাদের একটি নূতন বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা রণাঙ্গনের বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির কাজ করিতে পারে। মুক্তির জন্য শেষ সংগ্রাম হইবে দীর্ঘ ও কঠিন যেপর্যন্ত না শেষ ইংরাজটিদেশেরবাহিরে বিতাড়িত হয় সে পর্যন্তআমাদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।আমি আপনাদের উদ্দ্যেশ্যে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে চাহি যেআমাদের মুক্তিবাহিনী ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবার পর ব্রিটিশ শৃঙ্খল হইতে সমগ্র ভারত মুক্ত করিতে অন্ততপক্ষে বারো মাস কিংবা তাহারওবেশি সময় লাগিবে। সুতরাং আসুন আমরা নিজেদের শক্ত করিয়া তুলি এবং দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হই । (২ অক্টোবর ১৯৪৩, আজাদ হিন্দ বেতারথেকে ভাষণ, ব্যাংকক)। ❐

নাগরিক স্মৃতিচারণা

মৌলবি মুজিবর রহমান
এক বিস্মৃত সাংবাদিক

মিলন দত্ত

২

মৌলবি মুজিবর রহমান কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে অন্তত ছ'টি বাড়িতে বাস করেছেন বলে আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারছি। প্রথম কলকাতায় এসে তিনি চাচার কাছেই ছিলেন। সেই বাড়ি কোথায় ছিল আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু পরে চাচা চাকরি ছেড়ে ক্যানাল ইস্ট রোডে চলে যান।মুজিবর রহমানও কিছু কাল সেখানেই ছিলেন। শিয়ালদা কোর্টে পেশকারের কাজ করার সময়েও তিনি চাচার কাছেই থাকতেন। কিন্তু মনিহারি দোকান খোলার পর থেকে মুজিবর রহমান বৌবাজার স্ট্রিটে তাঁর দোকান সংসগ্ন ঘরেই বাস করতে শুরু করেন। ১৯০৯ সালে পত্রিকা ৭১, লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হলে তিনি সেখানেই বাস করতে শুরু করেন। পরে ১৯২০ সালে ১১/৫, করেয়া বাজার রোডে 'দ্য মুসলমান'-এর দফতর স্থানান্তরিত হলে ওই বাড়িতে মুজিবর রহমান নেহালপুর থেকে তাঁর মাকে এনে রাখেন। তাঁর অতি প্রিয় চাচাতো ভাই (ছোট চাচা মুন্সি আবদুর রউফের পুত্র) রফিকুর রহমানকে স্ত্রী-পুত্র সমেত নিজের বাড়িতে এনে রাখেন। রফিকুরের পুত্র আমিল ছিল তাঁর অতি প্রিয় পাত্র।

১৯৩৫ সালে দেনার দায়ে 'দ্য মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড' লিকুইডেশনে যায়। 'নিউ মুসলিম মজলিস'-এর খাজা নুরুদ্দিন 'দ্য মুসলমান'-এর সত্ব কিনে নেয় এই শর্তে, মুজিবর রহমানই বরাবর পত্রিকার সম্পাদক থাকবেন এবং তাঁর সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত এবং নীতিতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিন্তু ডিরেক্টররা সে কথা রাখেননি। মুজিবর রহমানও মাথা নোয়ানোর পাত্র নন। শেষপর্যন্ত তাঁর নিজে হাতে গড়া পত্রিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। তত দিনে তিনি সত্তর পেরিয়েছেন। ১৯৩৬ সালে বৃদ্ধ, কর্মক্লান্ত, হতোদ্যম মুজিবর রহমান কলকাতা ছেড়ে নেহালপুরে চলে যান। তার কিছুদিন পরেই 'দৈনিক দ্য মুসলমান' চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর শেষ জীবনটা কাটে নেহালপুরে।

মুজিবর রহমান গ্রামে ফিরে বসবাস করার জন্য একটা উন্মুক্ত নির্জন জায়গায় খড়ে ছাওয়া একটা কুটির নির্মাণ করেন। নাম দেন 'The Retreat' স্থানীয় লোক অবশ্য বলতেন বাগানবাড়ি। আজও সেটি বাগানবাড়ি নামে পরিচিত। কিন্তু সেই বাড়িতে তাঁর বাস করা হয়নি বেশি দিন। ১৯৩৭ সালে ১৭ অক্টোবর রাতে তিনি হঠাৎই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। গ্রামে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমিনুর রহমানের বই থেকে জানতে পারি, চাচাতো ভাই এবং সহকর্মী রফিকুর রহমান তাঁকে 'কলকাতায় ১৮। ২। বি, বালুহাক্কাক লেনে তাঁর ভাড়ার বাসায় নিয়ে গিয়ে তোলেন। ওই ছোট বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তাই তাঁদের উঠে যেতে হয় ১১৮/১৫, লোয়ার সার্কুলার রোডে অ্যাডভোকেট নুরুল হক চৌধুরীর বাড়িতে। বড় তিন কামরার বাড়ি, ভাড়া ৬০ টাকা। ওই বাড়িতে অসুস্থ মুজিবর রহমানকে যাঁরা দেখতে যেতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যহুমায়ুন কবির, জাস্টিস মসি, গোলাম মোস্তাফা, ড. আর আহমদ, আমির উদ্দিন চৌধুরী, আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, নবাবজাদা খানবাহাদুর মোহাম্মদ আজম, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, আবুল মনসুর আহমদ, প্রফেসর আবু হেনা, হাজি আবদুর রশিদ, হাকিম মশিউর রহমান, ডা. মঞ্জুর আহমদ এবং আরও অনেকে।'

১৯৩৮ সালের ১৬ অগস্ট মুজিবর রহমানকে দেখতে যান তদানীন্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু। পক্ষাঘাতের ফলে মুজিবর রহমান বাকশক্তি হারিয়েছিলেন। কিন্তু সব কথা বুঝতে পারতেন, ইঙ্গিতে মনের ভাবও কিছুটা বোঝাতে পারতেন। কিছুদিন

পরে সোয়ার সার্কুলার রোডের ওই বাড়িতে হঠাৎ মেরামতির কাজ শুরু হওয়ায় ধুলো-বালিতে অসুস্থ মুজিবর রহমানের অসুবিধা হচ্ছিল, ফলে ওই বাড়িও ছাড়তে হল। গেলেন পি-২৮৮, দর্গা রোডে একটা বাড়িতে। সেখানে ১৯৪০ সালের ২৬ এপ্রিল মুজিবর রহমান আবারও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণহয়ে সংজ্ঞা হারান। সেদিনই বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়। পরের দিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয়, 'শনিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় পার্কসার্কাস ময়দানে মৃতের উদ্দেশ্যে শেষ প্রর্থনার অনুষ্ঠান হইবে।' সেই জানাজায় ইমামতি করেছিলেন মওলানা আকরম খাঁ আর সেই জানাজায় শরিক ছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ। মৌলাবি মুজিবর রহমানের অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দর্গা রোডের বাসায় দেখতে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েও সুভাষবাবু মুজিবর রহমানের প্রতি শেষসম্মান জানাতে ওই বাড়িতেই গিয়েছিলেন। সচ্চরিত্র ও সাধুতার জন্য অনেকেই তাঁকে বলতেন 'নেহালপুরের দরবেশ'। নেহালপুরে পৈত্রিক ভিটেতে পিতামহের সমাধির পাশে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। ২৭ এপ্রিল কলকাতার বাংলা ও ইংরেজি অনেকগুলো পত্রিকায় তাঁর প্রয়াণ-সংবাদ এবং সঙ্গে মুজিবর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয়। সর্বত্রই তাঁর সাংবাদিকতা এ রাজনৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ও সততা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এ বইয়ে একটি পৃথক অধ্যায়ে প্রয়াণ-সংবাদগুলো দেওয়া হয়েছে।

১৯৪০ সালের ১০ মে নেহালপুরে প্রথম স্মৃতিসভা ১ অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু একটা বার্তা লিখে পাঠিয়েছিলেন 'আমাদের এই অভাগা পরাধীন দেশে খাঁটি মানুষ খুবই বিরল। যে কয়জন খাঁটি মানুষ পাওয়া যায় তাঁরাই আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মৌলবি মুজিবর রহমান সাহেব ঐ রিবল মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই রকম মানুষ খুবই কম দেখেছি; এ কথা লৌকিকতা নয়, ইহা আমার প্রাণের কথা। মুজিবর রহমান সাহেব সরল, সোজা, আন্তরিকতাপূর্ণ দৃঢ়চেতা মানুষ। তাঁর মেরুদণ্ড সরল ও সোজা ছিল, তাই আদর্শ ব্যতিত আর কারও নিকট তিনি ইহলোকে নিজের মাথা নত করেন নি। এই রকম মানুষ যেন আমাদের দেশে শত শত জন্মায়; আজ ইহাই আমাদের কামনার বিষয় হওয়া উচিত। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র স্বদেশ প্রেম, দৃঢ় সংকল্প, কর্তব্যনিষ্ঠা, অমায়িকতা, আন্তরিকতা বাঙালি আর ভারতবাসীকে যেন উদ্বুদ্ধ করে, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা ও প্রার্থনা। তাঁকে আমি দৈনন্দিন জীবনে কাজের মধ্যে দেখেছি, খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে দেখেছি, আইন অমান্য আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে দেখেছি, কারাগারেও দেখেছি; ফলে তাঁর প্রতি আমার একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মেছিল। আজ তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা সমর্পণ করে ধন্য হতে চাই।' (দৈনিক 'আজাদ'-এর ১২ মে ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত)।

সাংবাদিকতা এবং রাজনীতি জীবনের অনেকটাই আমরা জানতে পারি, কিন্তু কেমন ছিলেন ব্যক্তি মুজিবর রহমান? তা জানার তেমন কোনও সূত্র আমাদের নাগালে নেই; যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে বা দূর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের স্মৃতিচারণায় যেটুকু পাওয়া যায়। তাঁর জীবনীকার এবং চাচাতো ভাই আমিনুর রহমানের বই থেকে জানতে পারি, তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট চায়ের সমঝদার। তাঁর লেখায় পাই 'মুজিবর রহমানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল অতি সরল অনাড়ম্বর। পবিত্র শিশুর মতোই তিনি ছিলেন নিষ্পাপ। নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপারে তিনি শিশুর মতোই অবুঝ ও অভিমানী হয়ে পড়তেন। পরিতৃপ্ত শিশুর মত প্রসন্ন হাসিটি সারাক্ষণ তাঁর মুখে লেগে থাকত, তা যত দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিনি দিন যাপন করুন না কেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন। ঘরের কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে মাকড়শা তাঁর ঘরের আনাচে-কানাচে জালবুনতে পারত না। ঝাড়ন, ঝুলঝাড়া তাঁর হাতের কাছেই থাকত। বাড়িতে পরা জামা-কাপড় তিনি প্রায় সময় গোসল করার আগে নিজেই কেচে নিতেন। নিজের কাজ নিজে করতে তিনি পছন্দ করতেন। পারত পক্ষে অন্যদের ফরমাস করতেন না।

কোনও রকম নেশাই তাঁর ছিল না। পান, তামাক কখনো মুখে দেননি। সকালে ও বিকেলে দু'বার মাত্র চা পান করতেন। চায়ের ব্যাপারে তাঁর কিছু আভিজাত্য ও সৌখিনতা ছিল। বলা চলে মুজিবর রহমান মাঝে মাঝে বলতেন, কোন ভদ্রলোকের রুচি ও কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাড়িতে চা খেয়ে। বাজারের সেরা ব্রুকবন্ড চা তিনি কিনতেন এবং নিচে রান্নাঘর থেকে ফুটন্ত পানি আনিয়ে নিজের হাতে তৈরি করতেন এবং তাঁর শয়নকক্ষের আরাম কেদারায় বসে। ঝামেলা কম নয়। প্রথমে অল্প গরম পানিতে টিপটটা ধুয়ে নিয়ে তাতে চামচ মেপে পাতা চা দিতেন এবং প্রয়োজনমতো গরম পানি ঢেলে বালাপোশের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতেন। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা খুলে চামচ দিয়ে লিকারটানেড়ে দেখতেন ঠিক রং হয়েছে কিনা। কড়া বা ফিকে কোনটাই চলবে না। তারপর ছাকনি দিয়ে চা ঢেলে নিতেন ও দুধ চিনি মিশিয়ে পান করতেন।'

আমিনুর রহমানের বই থেকে আরও জানতে পারি, 'মুজিবর রহমান বাড়িতেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। তাঁর দৈনিক আহার, নিদ্রা, নামাজ, লেখাপড়া সবই ঘড়ি ধরে চলত। একটুও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। যতই কাজ থাকুক না কেন কিংবা যত নাম করা ব্যক্তিই দেখা করতে আসুক না কেন, খাওয়া বা নামাজের সময় হলেই তিনি উঠে পড়তেন। অভ্যাগতদের বলতেন, 'মাফ করবেন, একটু ভেতর থেকে আসছি।'

'সাংবাদিক মুজিবর রহমান' গ্রন্থের প্রণেতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক আবুল ফজল তাঁকে কম সময়ের জন্য হলেও দেখেছিলেন কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, 'মুজিবর রহমান ছিলেন আদর্শবাদী আর

ছিলেন চিরকুমার। আমি তাঁকে মাত্র কয়েকবার দেখার সুযোগ পেয়েছি; সম্পাদকীয় টেবিলে লেখারত নিরহঙ্কার মুজিবর রহমানের সৌম্যমূর্তি আজো আমার মনে আছে। শান্ত ও গম্ভীর চেহারার লোক ছিলেন তিনি, শুনেছি তাঁর প্রকৃতিও ছিল তাই। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় আবেগহীন, কিন্তু যুক্তি-নির্ভর। এ যুক্তিপূর্ণ সম্পাদকীয়ই ছিল 'The Mussalman'-এর বৈশিষ্ট ও আকর্ষণ। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ইংরেজি শিক্ষিত আর চাকরিজীবী মুসলমানদের টেবিলে টেবিলে তখন একমাত্র The Mussalman-ই শোভা পেত। আমি এমন মুসলমান অফিসার কম দেখেছি যার টেবিলে এক কপি 'দি মুসলমান' থকতো না। বিশেষ করে মফস্বলবাসী মুসলমান অফিসারদের প্রিয় ছিল এ পত্রিকাখানি।'

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও আইনজীবী হিসেবে খ্যাত আবুল মনসুর আহমেদ (১৮৯৮-১৯৭৯)'দ্য মুসলমান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। ওই চার বছর সহ-সম্পাদক হিসেবে 'দ্য মুসলমান'-এ কাজ করেন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে ওকালতি করার জন্য ময়মনসিংহে চলে যান।আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর স্মৃতিচারণা মূলক একটি প্রবন্ধে মুজিবর রহমান সম্বন্ধে লেখেন 'খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ১৯২২সাল হতে মৌলবি মুজিবর রহমানের সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করি। কিন্তু ছাত্রজীবনে ১৯২৬ সাল হতেই 'দি মুসলমানের' সম্পাদক হিসেবে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। তখন হইতেই আমি তাঁকে ভক্তি করতে শিখি। তারপর ১৯২৬ হতে ১৯২৯সাল পর্যন্ত পুরো চার বছর কাল তাঁর পায়ের কাছে বসে সাংবাদিকতা ও রাজনীতি শেখার সৌভাগ্য লাভ করি। এই সময়ে আমি এই মহান ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পাই।

মুজিবর রহমানের মহত্ব ছিল পর্বতের মত বিশাল। অন্যান্য নেতার মত নিকটে তরঙ্গ দূরে রজতরেখা নয়। মুজিবর রহমানের শ্রেষ্ঠত্ব পর্বতের মত। যত কাছে যাওয়া যায়, উঁচু হয় সেটা। দূর হতে তাঁকে বড় মনে হয়েছে নিশ্চয়ই, নাগালের বাইরে মনে করিনি। কাছে এসেছি,তাঁর শাগরেদি করেছি। কিন্তু কি দেখেছি?তাঁর যত কাছে এসেছে তিনি তত উঁচু হয়েছেন। আরও কাছে। আরও উঁচু। এভাবে বুঝেছি, তিনি তাঁর চেয়ে উঁচু ছিলেন।

একাধিক্রমে এক-লাগা চারটা বছর তাঁর চাকরি করেছি। সে চাকরি জীবনে অভাব অনটনে দিন কাটিয়েছি।'দি মুসলমানের' অভাবই ছিল আমাদের অভাব। তার সচ্ছলতাই ছিল আমাদের সচ্ছলতা। স্বচ্ছলতার চেয়ে অভাবের দিনগুলোই ছিল বেশি লম্বা। সে অভাব অনটনের মধ্যে মৌলবি মুজিবর ছিলেন তাঁর অধিনস্ত লোকজনের সমান অংশীদার। অভাবের সংসার বাপ বেটার সম্পর্ক খারাপ হয়। তাদের মধ্যেও আসে নীচতা ক্ষুদ্রতা। কিন্তু আমাদের অভাবঅনটন মৌলবি সাহেবের কোন মহত্বে কোন নীচতা তাঁর পিতৃত্বে কোন আত্মপরতা স্পর্শ করতে পারেনি।তাঁর শ্রেষ্ঠতা এখানেই।

মৌলভী মুজিবর রহমানের মহত্ব, বিশালতা,তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য, সততা, সাধুতা ও ধর্মপ্রাণতা তাঁর সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর কাছে তাঁকে এমন এক বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে, সকলে তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন'সেইন্ট অব নেহালপুর';নেহালপুরের দরবেশ।

কঠোর পরীক্ষায় তাঁর অমিত তেজ, চরম দারিদ্রের মধ্যেও তাঁর নিষ্কলঙ্ক সাধুতার দৃষ্টান্তেতাঁর ঘটনাবহুল জীবনের প্রতিদিন পরিপূর্ণ।

আমাদের রাজনৈতিক জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান অসাধারণ। কিন্তু আমাদের সাংবাদিক জীবনে তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। আর কেউ কিছু করুন আর না করুন, আমাদের সাংবাদিকরা মুসলিম সাংবাদিকতার পিতা মৌলবি মুজিবর রহমানকে ভুলবেন না, এ আশাআমি নিশ্চয়ই করতে পারি।' (আমিনুর রহমানের 'মৌলবি মুজিবর রহমান ' বই থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে। আবুল মনসুর আহমেদের কোন বইয়ের কোন প্রবন্ধ থেকে তিনি এটা সংগ্রহ করেছেন তার উল্লেখ নেই। তবে আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'-এ 'দ্য মুসলমান' এবং মৌলবি মুজিবর রহমানের একাধিক উল্লেখ পেয়েছি।) (পরের সংখ্যায়)

ভ্রম সংশোধন : গত সংখ্যায় ' মৌলবি মুজিবর রহমান এক বিস্মৃত সাংবাদিক ' শীর্ষক নিবন্ধটির (পৃষ্ঠা - ৪) প্রথম বাক্যের শেষাংশে মুদ্রিত হয়েছে 'নেহালপুর গ্রামের পত্তন হয়েছিল ১৭৮৯ সালে , নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ'র আমলে।' এক্ষেত্রে শুদ্ধ পাঠ হবে 'আনুমানিক ১৭২৩ সালে।' সম্পাদক , নাগরিক ।

পুরনো লেখা ফিরে দেখা

বাংলা উপন্যাসের ধারায় গৌরকিশোর ঘোষ

সত্যপ্রিয় ঘোষ

১

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের হলেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস মাত্র একশত ত্রিশ বছরের। ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ সালে লেখেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী'। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলো ছিল রোমান্সে ভরপুর। এই কারণেই বঙ্কিমের চোদ্দটি উপন্যাসই অসম্ভব ও অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ওইসব উপন্যাসের চরিত্রগুলো ততটা বাস্তবসম্মত নয়, যতটা বাস্তব যারা সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের উপায় খুঁজে বের করতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসের একটি মূল বিষয় নরনারী অন্তর্নিহিত প্রেম। বঙ্কিম সেটা অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর উপন্যাসে যৌনতাকে তিনি বারবার

নিন্দা করেছেন। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩খ্রিস্টাধ), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খ্রিস্টাধ) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রিস্টাধ) উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে অন্তর্নিহিত প্রেম আর পারিবরিক জীবনের রক্ষণশীলতার দিকে। কারণ তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছেন। এখানে অনেক স্টেরিওটাইপ ভেঙেছেল তিনি। সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-অধিকারের পক্ষ নিয়েছেন তিনি। পরবর্তী ধারার নেতৃত্ব দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের তেরোটি উপন্যাস; 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রিস্টাধ), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬ খ্রিস্টাধ), 'শেষের কবিতা (১৯২৯ খ্রিস্টাধ)-তে বাংলার মেয়েদের অন্তর্জগতের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে বাইরের জগতে পা রাখার অধিকার মিলেছে।. একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত ইত্যাদিও বর্জিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি এসেছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য থেকে। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই প্রথম লেখক যাঁর এই মাটির সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক। তাঁর ইচ্ছা ছিল, মানুষ হয়েও যাদের কান্নার হিসাব মানুষ কখনো নেয়নি, সেই উপেক্ষিত মানুষদের সাহিত্যের আঙিনায় নিয়ে আসা। তাঁর সতেরোটি উপন্যাসের প্রায় সবকটিতেই ফুটে উঠেছে 'সমাজ নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতারা' বাস্তব জীবনে কী বিশাল আকারে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬খ্রিস্টাধ), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭খ্রিস্টাধ), 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩ খ্রিস্টাধ), 'গৃহদাহ' (১৯২০ খ্রিস্টাধ), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১ খ্রিস্টাধ) ইত্যাদি উপন্যাসে যুগ যুগ ধরে সম্মানহীন নারী জাতিকে চিত্রিত করা হয়েছে। বাহ্যিক আন্দোলনের মাধ্যমে কেন নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া যাবে না, সে প্রশ্নও তুলেছেন শরৎচন্দ্র।

বিংশ শতাধীর বিশ ও ত্রিশের দশকে শুধু ইংরেজি সাহিত্যই নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নানা ভাবনাও বাংলা উপন্যাসকে সামগ্রিকভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম, উচ্চমার্গের বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা এবং শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মণ সমাজব্যবস্থার নিয়তি-নির্ধারিত প্রেমে আবদ্ধ না হয়ে, কতিপয় সাহিত্যিক সুদূর সাগরের ওপার থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক জীবনধারা প্রচার করতে তৎপর ছিলেন। দার্শনিক এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের নতুন দিকনির্দেশনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁরা হলেন শোপেনহাওয়ার, নিৎশে, ফ্রয়েড, মঁপাসা, হ্যামসুন, জোহান বোয়ার, লরেন্স, পিরান্দেলো, আন্দ্রে জিদ। এর পাশাপাশি আরেকটি ধারারও আবির্ভাব ঘটে, যার পেছনে ছিল রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণা এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, গোর্কি, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেভ, ফ্লাবেয়ার প্রমুখ। তাদের প্রভাবে উপন্যাসে দেখা দেয় আদিম যৌন আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নাবেশ এবং নির্লজ্জ যৌনতার ঢেউ। উপন্যাসে অশ্লীলতা বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালের লেখকদের হাতে শ্রমিক, কৃষক, চোর, পথচারী, ভিক্ষুক, এমনকি ছোট মুদিও কোনো বাধা ছাড়াই প্রবেশ করে। এই দুই দলের উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, জগদীশ গুপ্ত, মনোরঞ্জন প্রমুখ। এদের কেউই উপন্যাসের মহান প্রতিভা স্বীকৃতি পাননি কারণ তাঁরা স্বদেশি ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন না। বিদেশী কলমী গাছে কিছু মৌসুমী ফুল অল্প সময়ের জন্য ফুটেছিল কিন্তু স্থায়ীভাবে ফুল ফোটেনি।

ত্রিশের দশক থেকে যে তিনজন ঔপন্যাসিকের উপর স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পড়েছিল তাঁরা তিন জনই ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায়; বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর এবং মানিক। এই তিনজন বাংলা উপন্যাসকে সতুন ধারায় ত্রিবিধ সম্পদে ভরিয়ে দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯ খ্রিস্টাধ) থেকে শুরু করে 'অপরাজিত' (১৯৩২ খ্রিস্টাধ), 'আরণ্যক' (১৯৩৯ খ্রিস্টাধ), 'অশনিসংকেত' (রচনাকাল ১৯৪৪-৪৬, বই আকারে ১৯৫৯ খ্রিস্টাধ), ইছামতী (১৯৫০খ্রিস্টাধ)-র মতো চোদ্দটি উপন্যাসে বিভূতিভূষণ গ্রামবাংলা এবং বিহার সহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের বন্য প্রকৃতির রূপ-স্বাদ-গন্ধ উপস্থাপন করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। শুধু অরণ্য-বৃক্ষাদিই নয়, তাঁর লেখায় গ্রাম্য বিবাদ, কূটনীতি, শকুনি-সদৃশ নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিও উপস্থিত কারণ তাঁর রচনার মূল ধারা আমাদের কল্পনাকে শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষায় রঙিন করে না, তাঁর লেখা আমাদের ভাবজগতের সঙ্গে বাস্তব জগতেও নিয়ে যায়। বাঙালির মনে (চলচ্চিত্রের ফলে, সারা বিশ্বের মনে, 'পথের পাঁচালী'-র কিশোর নায়ক 'অপু' হয়ে উঠেছেন কৈশোরের প্রতীক। অগণিত বাবা-মায়ের স্বপ্নের 'প্রথম বসন্ত'-এর নাম অপু। প্রত্যেক বাবামার মনে গেঁথে থাকে এক ভয়ানক আতঙ্ক যার নাম 'দুর্গা'। বাঙালি বাবা-মার কাছে এই দুটি নাম সুখ আর দুঃখের।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সামন্ততন্ত্রের ভগ্নদশা, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতাল, বাউরি, কাহার, বাউল, বৈরাগী, সাপুড়ে, ডোম, ঝুমুরের দল ইত্যাদির নৃত্য-গীত জীবনের আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘুর্ণী' (১৯৩১ খ্রিস্টাধ) থেকে 'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯ খ্রিস্টাধ), 'কালিন্দী' (১৯৪০ খ্রিস্টাধ), 'কবি', 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রিস্টাধ), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রিস্টাধ), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২ খ্রিস্টাধ), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩ খ্রিস্টাধ) ইত্যাদি ৫৭টি উপন্যাস তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখকের স্বীকৃতি দিয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের অন্তর্নিহিত চেহারা যা শ্রেণী সংগ্রামে ভরা। তাঁর 'দিবরাত্রির কাব্য' (১৯৩৫ খ্রিস্টাধ), 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬ খ্রিস্টাধ), 'অহিংস' (১৯৪১ খ্রিস্টাধ), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪২ খ্রিস্টাধ) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি ধনী তথা পেটিবুর্জোয়াদের আত্মরতি, যৌনবিকৃতি, লোভ, স্বার্থপরতা আর অন্তসারশূন্যতার চিত্র তুলে

ধরেন। কমিউনিস্ট হওয়ার পর তার লেখার মূল বিষয় হয়ে ওঠে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬খ্রিস্টাধ) উপন্যাসে রয়েছে গ্রামের নৌকার মাঝি-মাল্লাদের জীবন-সংগ্রামের কথা আর 'শহরতলী' (১৯৪০ খ্রিস্টাধ) উপন্যাসে শহরে বসবাসকারী শ্রমিকদের রুজি-রুটির জন্য একত্রিত হয়ে একটি ইউনিয়ন গড়ে তোলার বিস্ময়কর কাহিনি। এটা তিনি কমিউনিস্ট হওয়ার আগে লিখেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এমন একটি বিষয়কে উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ছত্রিশটি উপন্যাস লিখেছেন। 'দর্পণ' (১৯৪৫ খ্রিস্টাধ), 'চিন্তামণি' (১৯৪৬ খ্রিস্টাধ), 'চিহ্ন' (১৯৪৭ খ্রিস্টাধ) এবং 'সোনার আছে দামি' (১৯৫১ খ্রিস্টাধ) প্রভৃতি উপন্যাসও তাঁর স্থায়ী কীর্তি।

ত্রিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে অনেক লেখক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও ফর্মে ব্যাপক বৈচিত্র্য এনেছিলেন। যৌক্তিক চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যরা হলেন; ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার রায়, গোপাল হালদার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কাহিনিনির্ভর ও রোমান্টিকদের মধ্যে ছিলেন বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শঙ্কর প্রমুখ। রাজনৈতিক পটভূমিতে ব্যক্তি ও সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলোকে সামনে আনেন সতীনাথ ভাদুড়ী, রমেশচন্দ্র সেন, সুবোধ ঘোষ, সুশীল জানা, অসীম রায়। ঐতিহাসিক পটভূমিতে আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে উপন্যাস রচনা করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, কমলকুমার মজুমদার প্রমুখ। ডিটেকটিভ রহস্য-রোমাঞ্চের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রবল সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ লেখকই কায়েমি স্বার্থের অনুসারী ছিলেন। ফলে সেই সময়ের তিনটি ভয়ঙ্কর ঘটনা; মন্বন্তর, বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ত কালোবাজারি, নৈতিক মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্য দিতে দেশভাগের বিষয়বস্তু কবিতা ছোটগল্প বা নাটকে পাওয়া গেলেও উপন্যাসে তার যথাযথ প্রাতিফলন ঘটেনি; এটা তৎকালীন বাঙালি ঔপন্যাসিকদের জন্য খুবই দঃখের কথা।

মহারাষ্ট্র ও কেরালার মতো বাংলাও সে সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে সোভিয়েত ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের জোট ফাল্গু ধারার মতো বয়ে চলেছিল। সে সময় প্রথম শ্রেনীর কয়েকজন মহান লেখক (উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়) সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় সকল লেখকের জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকে অগ্রগতির লক্ষণ বলে মনে করা হত।

সে সময় বামপন্থী পত্র-পত্রিকাই তরুণদের উত্তেজিত করে রেখেছিল। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধ সম্পূর্ণরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। ইংরেজিতে যাকে বলে পোলারাইজেশন। মহাভারতের ভাষায় একে বলা হয় 'সেনোদ্রযোগ পর্বাধ্যায়'; কে কোন শিবিরে যোগ দেবে তার প্রতিশ্রুতির সময়কাল।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতম অধিবেশনে স্ট্যালিন-বিরোধী অবস্থান গ্রহণের ফলে হঠাৎ করে কমিউনিস্ট বিশ্বে চাপ সৃষ্টি হয়। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সাম্যবাদী আদর্শে ফাটল ধরে এবং আস্থায় চিড় ধরে, যার পরিণতিতে ষাটের দশকের বামপন্থীদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। ততদিনে এখানকার দক্ষিণপন্থী লেখকরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। একই সঙ্গে, পশ্চিমা বিশ্বের মতো, এখানেও অস্তিত্ববাদী দর্শনের যুক্তি থেকে মোহামুক্তির ঢেউ ওঠে; সার্ত্র কে কতটা পড়েছে এবং বুঝেছে, তাদের কার লেখায় তার কতটা প্রতিফলন তারই তর্ক-বিতর্কে কফি হাউস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এটি আরও মজার হয়ে ওঠে যখন জানা যায় সার্ত একজন কমিউনিস্ট। এবং তারপর অস্তিত্ববাদ কমিউনিজমের সাথে মিশে যায়। অস্ট্রিয়ার লেখক ফ্রাঞ্জ কাফকার গল্প 'মেটামরফোসিস'-এর নায়ক যে নিজেকে পোকায় রূপান্তরিত হতে দেখে, 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসের নায়ক জোসেফ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা না-করা এবং 'দ্য ক্যাসেল'-এর নায়ক 'কে' সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরেই সফলতা পায়; এমন নেতিবাচক জীবনদর্শন দেখতে দেখতে এবং অ্যালবার্ট কামুর কিমিতিবাদী জীবনদর্শন দেখার পর বাঙালি লেখকরা নিজেদেরকে এক অগোছালো, অদ্ভুত, বাধামুক্ত জীবনের স্রোতে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে 'নতুন পথের' ভিত্তিহীন 'চেতনার উৎসে' প্রবাহিত হতে থাকে। এবং, অনুরূপ সিজোফ্রেনিক অসঙ্গতি সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করতে শুরু করে, এই পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যে যে তরুণ লেখকরা তাদের শক্তিশালী লেখনী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তাদের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষ অন্যতম সেরা। (পরের সংখ্যায় সমাপ্য)

বাংলাদেশে আদিবাসী বলে পরিচিতরা আক্রান্ত

শুভ বসু

বাংলাদেশে আদিবাসী শব্দ নিয়ে বিতর্ক প্রবল।পাঠ্য পুস্তকে আদিবাসী শব্দটার প্রয়োগ নিয়ে ছাত্রদের একাংশ আন্দোলন করতে নেমে পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন এবং ছাত্র সার্বভৌম বলে এক সংগঠনের হাতেও মার খেয়েছেন।

আদিবাসী শব্দটা মূলত settler colonial সোসাইটি থেকে এসেছে। অভিবাসনকারী ঔপনিবেশিকতাবাদের ফলে অস্ট্রেলিয়া কানাডা নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর জনবিন্যাসের প্রকৃতি

বদলে গেছে। সেখানে গণহত্যা হয়েছে। এখনো কানাডার সমাজে তার চিহ্ন রয়েছে। আমাদের McGill বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠানের সূচনাতে মনে করিয়ে দেওয়া হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আদিবাসী জনজাতির শিকারিদের মিলন ক্ষেত্র। ভারত বর্ষে আদিবাসী শব্দটা ঔপনিবেশিক জ্ঞান ভাষ্যের (কলোনিয়াল এপিস্টেমলজি) সঙ্গে যুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসকরা তাঁদের নিজেদের বাইরে থেকে এসে সামরিক বাহিনীর মধ্যে দিয়ে জয় করার ফলে ইতিহাসের পাতায় বহিরাগত সামরিক শক্তির জোরে বিজয়ী খুঁজে বেড়াতেন। ফলে তাঁরা আবিষ্কার করলেন আর্যরা শুধু একটি বিশেষ ভাষা ভিত্তিক নৃতাত্বিক গোষ্ঠী নন তাঁরা সামরিক বিজয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ফলে আর্য্যতত্ত্ব বলে এক জাতি ভিত্তিক তত্ত্বের অবতারণা করলেন। ভারতীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তার দ্বারা মোহিত হলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে লিখলেন

মোক্ষমুলর বলেছে ক্ষ্মআর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।

কিন্তু সেই আর্য্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁরা খাড়া করলেন আদিবাসী তত্ত্ব কে। ফলে তাঁরা পরিচিতি করালেন মধ্য ভারতের এবং পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তীর্ন জঙ্গল, মালভূমির লোকেদের উপজাতি আদিবাসী বলে। উপজাতি বা Tribe শব্দটার ব্যঞ্জনা একান্ত পীড়াদায়ক। কারণ তার মধ্যে একটি উত্তরাধুনিক তাত্বিক দিপেশ চক্রবর্তীর ভাষায় ওয়েটিং রুম অফ হিস্ট্রি র বৈশিষ্ট লুকিয়ে রয়েছে। জাতি বা নেশান হলো সভ্য কিন্তু উপজাতি হলো tribe। মানে সভ্যতার বহির্ভূত। আসলে অষ্টাদশ শতক থেকে দক্ষিণ এশিয়াতে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটে। সেই কৃষিভিত্তিক সমাজের বাইরে যাঁরা জাত পাতের বাইরে বসবাস করতেন তাঁদের আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয়। এটিও উপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্যর সাফাই- শুধু আমরাই Settler Colonial সমাজ তৈরী করিনি আগেও তা ছিল।

তাহলে কি বাংলাদেশের আদিবাসী শধটা পাঠ্য পুস্তকে থাকা অবিবেচ্য। কিন্তু আদিবাসী শধটার অন্য ব্যঞ্জনা রয়েছে । কৃষি সভ্যতার সম্প্রসারণের ফলে জাত পাত শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হন। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বর্তমান ভারত এবং বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এবং তিব্বতি মালভূমির মানুষের বহুবিধ সংস্কৃতির ধারা প্রচলিত রয়েছে। তাঁরা সমতলের কৃষিভিত্তিক সমাজের বাইরে একটি ঝুম চাষের ভিত্তিতে ভিন্ন ধরণের সামাজিক সংস্কৃতিতে বসবাস করেন। তাঁদের একটি নিজস্ব পরিচিতি রয়েছে। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব এলাকায় সাংস্কৃতিক ভিন্নতার স্বীকৃতি চান এবং সম্পদের পুনর্বণ্টন চান। এর সঙ্গে বাংলাদেশের মূল রাজনৈতিক স্রোতের কোন বিরোধ নেই। বাংলায় মুসলমানরা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে কারণ তাঁদের ভয় ছিল তাঁদের প্রান্তিক কৃষক হয়ে থাকতে হবে এবং তাঁদের ধর্মীয় স্বাধিকার থাকবে না। সেই কারণে তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনে জোর শোর সমর্থন দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবে বা সিন্ধে বা খাইবার পাখতুনকোয়াতে মুসলিম লীগ ততটা রাজনৈতিক সাফল্য পান নি যা তাঁরা বাংলায় পেয়েছিলেন।

আবার পাকিস্তান শব্দটার মধ্যে বাংলার কোনো উল্লেখ নেই। পাঞ্জাব, সিন্ধু , আফঘানিয়া, কাশ্মীর বালুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশের আদ্যক্ষর নিয়ে চৌধুরী রহমত আলী বলে কেমব্রিজের এক ছাত্র শব্দটি তৈরী করেছিলেন। পরে চৌধুরী রহমত আলী বঙ্গ ই ইসলামিস্তান বলে একটি শব্দ বলেন। লাহোর প্রস্তাবের পর ভারতের মূলত কংগ্রেসের সমর্থক সংবাদ মাধ্যম যখন ' পাকিস্তান ' প্রস্তাব বলে তখন জিন্না সাহেব পাকিস্তান বলে মেনে নেন। তাঁর ভাষ্য ছিল 'So be it'।

আবার পাকিস্তানে বাংলার মানুষেরা স্বাধিকার আন্দোলন করলেন তাঁদের ভাষার স্বীকৃতির এবং সম্পদের পুনর্বণ্টনের জন্যে আন্দোলন করলেন। তার থেকে জন্ম হলো বাংলাদেশের। আবার সেই বাংলাদেশে যখন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়েছে বলে মনে হয় তখন তাঁরা এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং ২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন করেন। তাহলে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল অধিকার সম্বলিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরী করা। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো ভিন্নতার স্বীকৃতি নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে। কাজেই বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ যদি ভিন্নতার স্বীকৃতি চান এবং নাগরিক অধিকার চান তা দিতে আপত্তি কি?

আসলে ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে গিয়েছিলো র‍্যাডক্লিফসাহেবেরখেয়ালে।কারণসেখানকারজনগোষ্ঠীরমধ্যেমুসল মানসমাজেরস্পর্শ ছিলনা ।বাংলারবহু এলাকায় এই জিনিস হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। একবার ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল খুলনা যেখানে হিন্দুরা সামান্য সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলেন তা ভারতে আসবে আর মুর্শিদাবাদ যেখানে মুসলমানরা শতকরা ৫৫ ভাগ ছিলেন তা পাকিস্তানে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ ভারতে আসে এবং খুলনা পাকিস্তানে যায়। পাকিস্তান শাসন কালে কর্ণফুলি নদীতে কাপ্তাই বাঁধের ফলে বহু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বাস্তুচ্যুত হন। পরে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান গ্রহণ কালে মানবেন্দ্র লারমা প্রশ্ন করেন বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার পরিচিতি কেন বাঙালি হবে ? আজকে যখন বঙ্গবন্ধু বঙ্গশত্রু বলে চিহ্নিত এবং ১৯৭২ সালের সংবিধান ফ্যাসিস্ট সংবিধান বলে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কাছে পরিচিত এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চলছে তখন আদিবাসী শধটা মেনে নিতে দোষ কি। কেউ তো নিজদেশে পরবাসী হয়ে থাকতে চান না। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে লড়াই চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মধ্যে। বাংলাদেশের ২০২২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালিরা বান্দরবান জেলাতে (৫৮.৮৫), খাগড়াছড়ি জেলাতে ৫১.০৭ এবং

রাঙামাটি জেলাতে ৪২.৪২% ভাগ তখন তো বলতেই হয় তাঁরা নিজভূমিতে পরবাসী। ভারতের উত্তরপূর্ব ভারতের সাত বোন রাজ্যের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের গভীর সমর্থন আছে। মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার সময়ে আসামের উলফার নেতারা বাংলাদেশে অবস্থান করতেন। কাজেই সামান্য পাঠ্যপুস্তকের আন্দোলন নিয়ে এতো আপত্তি কেন ? তবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ শুধুমাত্র কি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অধিকার চান? তাহলে আর Settler Colonial মডেলের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ কি রইলো ?

এই প্রশ্ন বৃহৎ আকারে আমার সবার কাছে। ভারতেও আদিবাসীরা সুখ আছে এ দাবি আদিবাসীরা করেন না ? ছত্তিশগড়ে এবং ঝাড়খন্ডে মাওবাদ নিবারণের নামে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন হয়। আসামের চা বাগানে , ডুয়ার্সে র চা বাগানে বা জঙ্গল মহলে সবাই যে আনন্দে নৃত্য করছেন তা নয়। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত ছিল জনজাতি গোষ্ঠী গুলির স্বীকৃতি। রানা তন্ত্রের সময়ে জনজাতিদের মুলুকি আইনে যা নেপালের আইন ব্যস্থার ভিত্তি ছিল তাতে মদ্যপায়ী জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল। নেপালে জনজাতি সংঘের ইতিহাস পড়তে সুসান হাঙ্গেন এবং মাহেন্দ্রা লাওটির সম্পাদিত Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal Identities and Mobilization. Routledge– ২০১৩ বইটি পড়ুন। আলী রিয়াজ এবং আমার নেপালের উপর Paradise Lost বইটিতেও বিশদ আলোচনা রয়েছে।

কাজেই ঔপনিবেশিক জ্ঞানভায্যের থেকে মুক্তি পেয়ে গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার প্রতিষ্টার লড়াই দক্ষিণ এশিয়াতে বহু পথ অতিক্রম করতে হবে। নেপাল এ ব্যাপারে অগ্রণী। তার থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার চাকমা , মারমা , ত্রিপুরা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী কে বাদ দিয়ে আসবে না । ভয়ের সংস্কৃতি থেকে মুক্তি চান সবাই। ❐

দারিদ্র্য পরিমাপ না নয়া উদারিকরণের রূপচর্চা ?

প্রভাত পট্টনায়ক

বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের ‘চরম দারিদ্র্যপীড়িত’ জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে যেখানে ৩০ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০২২-এ সেটা ১০ শতাংশেরও কমে নেমে এসেছে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, নয়া-উদার পুঁজিবাদ ‘কয়েক মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্যের বাইরে নিয়ে এসেছে।’ এর চেয়ে চরম বিদ্রূপ আর কী হতে পারে! এ আসলে নয়া-উদার পুঁজিবাদের খানিক রূপচর্চা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রচুর আন্তর্জাতিক সংগঠনই এখন তারা যাকে ত্দারিদ্র্যদ বলে থাকে তার পরিমাপে ব্যস্ত। বিশ্বব্যাঙ্ক অনেক দিন ধরেই এই কাজটা করছে, তবে এখন আমাদের হাতে এসেছে ত্বহুমাত্রিক দারিদ্র্যদ-এর একটা নয়া মাপকাঠি যেটা তৈরি করেছে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এবং অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (ওপিএইচআই)। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, এসব কোনও মাপকাঠিই দারিদ্র্যের পরিমাপ করছে না। স্বভাবসিদ্ধভাবে তারা যেটা করছে সেটা হল; নয়া-উদার পুঁজিবাদের খানিক রূপচর্চা। বস্তুত, বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের ত্চরম দারিদ্র্যপীড়িতদণ্ড১ঞ্চ জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে যেখানে ৩০ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০২২-এ সেটা ১০ শতাংশেরও কমে নেমে এসেছে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, নয়া-উদার পুঁজিবাদ ত্কয়েক মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্যের বাইরে নিয়ে এসেছে।দ আসুন দেখা যাক, বিশ্বব্যাঙ্কের এই পরিমাপ ধারণাগতভাবে কতটা ত্রুটিপূর্ণ।

বিশ্বব্যাঙ্কের এই পরিমাপ-পদ্ধতির তিনটি মৌলিক গলদ রয়েছে। প্রথমত, এটিতে একজন ব্যক্তিমানুষের সম্পদের পরিমাণের কোনও হিসেব পাওয়া যায় না, কেবল আয়ের হিসেবটুকুই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এটিতে আয়ের পরিমাপক হিসেবে ব্যয় মাপা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রকৃত ব্যয় পরিমাপ করতে গিয়ে এটি মূল্য-সূচককে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছে, যে মূল্য-সূচক প্রায়শই জীবনধারণের খরচের প্রকৃত বৃদ্ধিকে কম করে দেখায়। ফলত, যে সাংখ্যমানগুলি এই সমীক্ষায় পাওয়া গেছে তা অধিকাংশেই ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

দারিদ্র্যের যে-কোনও অর্থপূর্ণ সমীক্ষাকে দুটি মাত্রা অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হয়। একটি ত্জঙ্গমদ মাত্রা, যেমন ধরা যাক আয়, এবং একটি ত্স্থাবরদ মাত্রা যা কোনও ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ গণনা করে। দুটি মাত্রাই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক কোনও ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আয়ের বিশেষ হেরফের হয়নি, কিন্তু ওই সময়সীমার মধ্যেই সে তার যা সম্পদ ছিল তার সবটাই খুইয়েছে, তখন সে যে দরিদ্রতর হয়েছে সেটা অস্বীকার করাটা তার সঙ্গে প্রতারণা-বিশেষ।

বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষায়, প্রথমত, এই সম্পদের হিসেবের কোনও উল্লেখই নেই। আসলে নয়া-উদার পুঁজিবাদের পরিচালনায় এ এক অনিবার্য এবং জ্বলন্ত ভ্রান্তি। কারণ, পুঁজির আদম সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া যখন চলে তখনই প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ দুর্বার গতিতে সম্পদহারা হতে থাকে। এখন, ভেবে দেখুন, একদিকে মানুষের এই সম্পদ খোয়ানো চলছে দুর্বার গতিতে, অন্যদিকে দাবি করা হচ্ছে ত্কয়েক মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্যের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে।দ এর চেয়ে চরম বিদ্রূপ আর কী হতে পারে!

দ্বিতীয়ত, এই সমীক্ষায় প্রকৃত আয়ও পরিমাপ করা হয়নি। কারণ, ভারত-সহ অনেক দেশেই মানুষের আয়ের কোনও তথ্য পাওয়া যায়

না। এবং তত্ত্বগতভাবেও তআয়দ হল একটি জটিল বিষয়। পরিবর্তে, অনিবার্যভাবেই, ব্যয় মাপা হয়েছে; যে-বিষয়টি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া তুলনায় সহজতর এবং যে-বিষয়টি তত্ত্বগতভাবেও সরলতর। ফলে, ব্যয়-কেই এক্ষেত্রে আয়ের বিকল্প হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, এই কারণেই, একজন মানুষের মোট সম্পদ পরিমাপ না করার অপরাধটি আরও অমার্জনীয় হয়ে পড়ে। মানুষের আয় যখন পড়েও যায়, তখনও তারা সম্পত্তি বিক্রি করে বা ধার করে আগের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। এখান থেকে, এই যে তাদের ব্যয় কমেনি, ফলে তাদের অবস্থার অবনতি হয়নি; এমন সিদ্ধান্তে আসাটা চূড়ান্ত অবাস্তব। বস্তুতপক্ষে, জঙ্গম মাত্রা; অর্থাৎ আয়, এবং স্থাবর মাত্রা; অর্থাৎ সম্পত্তি, দু-দিক দিয়েই মানুষগুলি দ্ব্যর্থহীনভাবে দরিদ্রতর হয়েছে; কিন্তু ব্যয়সূচক দেখাচ্ছে তারা আগের অবস্থাতেই রয়ে গেছে।

তৃতীয়ত, ভারতের মতো দেশগুলিতে প্রকৃত ব্যয় যেভাবে পরিমাপ করা হয়; কিছু সময় অন্তর-অন্তর সতর্ক নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে একেকটি পরিবারের খরচের হিসেব করা; সেটি মোটের ওপর ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এইভাবে ব্যয় পরিমাপ করতে মূল্য-সূচককে মানদণ্ড হিসেবে নেওয়া হয় এবং মূল্য-সূচক জীবনযাত্রার প্রকৃত ব্যয়বৃদ্ধিকে অনেকটাই কমিয়ে দেখায়।

মূল্য-সূচক হল ভিত্তিবর্ষে যে-সব পণ্যের চাহিদা থাকে সেরকম একগুচ্ছ পণ্যের মূল্যের একটা গড় মান। এটি ত্রুটিপূর্ণ কারণ, ভিত্তিবর্ষের পরবর্তী বছরগুলিতে যদি সেই পণ্যগুলির জোগান ঠিকমতো না থাকে তখন মানুষ অন্য পণ্য ক্রয় করে; এই পরিবর্তন এবং তার ফলগুলি মূল্য-সূচকে প্রতিফলিত হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, নয়া-উদারবাদের জমানায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো প্রচুর পরিষেবার বেরকারিকরণ একটি সাধারণ ঘটনা। এর ফলে এই সমস্ত পরিষেবাগুলির জন্য মানুষের ব্যয় প্রচুর বেড়ে গেছে। কিন্তু মূল্য-সূচকে সে-সব ধরা পড়ে না।

আবারও উদাহরণস্বরূপ, ভিত্তিবর্ষে ধরা যাক সরকারি হাসপাতালে একটি সার্জারির খরচ পড়ত ১০০০ টাকা, যেটা এখন পড়ে ২০০০ টাকা। এই হিসেবে মূল্য-সূচকে দেখা যাবে স্বাস্থ্য-পরিষেবার জন্য ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবত, ভিত্তিবর্ষে সরকারি হাসপাতালে যতগুলি সার্জারি হত এখনও ততগুলিই হয়, বা এমনকি কম হয়। যে-কারণে মানুষ বাধ্য হয় বেসরকারি হাসপাতালে যেতে, যেখানে সেই একই সার্জারির খরচ পড়ে ১০০০০ টাকা। মূল্য-সূচকে এসবও ধরা পড়ে না।

সংক্ষেপে বললে, মূল্য-সূচক যা দেখায় জীবনযাত্রার খরচ তার চাইতে অনেকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই সমীক্ষায় সেই মূল্য-সূচককেই ব্যয় পরিমাপ করতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা থেকেই 'প্রকৃত' ব্যয়ের হিসেব করা হয়েছে। মূল্য-সূচক মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেখায়, এবং, ফলত, গুরুতরভাবে কমিয়ে দেখায় দারিদ্র্যকে।

জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির জন্য মানুষের যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন প্রথমেই তারা দুটি পথ নেয়। এক, সম্পত্তি বিক্রি করা বা ঋণ নেওয়া। এবং দুই, তাদের ক্রয়সামগ্রীর চরিত্র বদলে ফেলে শুধুমাত্র 'প্রয়োজনীয়' জিনিসগুলিকেই খরিদ করা এবং কম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে বাদ দেওয়া।

স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং বাচ্চাদের লেখাপড়ার খরচের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে ভারতে এই দুটি বিষয়ই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় পরিবারগুলির, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে, মোট সম্পদের পরিমাণ লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে পুষ্টিকর খাবারের জন্য খরচ করতেও তারা কার্পণ্য করছে। এখানে একটি (ভুল) বিশ্বাস রয়েছে যে পুষ্টির দিকটাতে কিছু কাঁটছাট করলে এমন কিছু ক্ষতি হয় না। ২০১৩-র অল ইন্ডিয়া ডেবট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভে (এতে ২০১২-র জুন মাস পর্যন্ত তথ্য আছে)-র সঙ্গে ২০১৯-এর একই সার্ভে (এতে তথ্য রয়েছে ২০১৮-র জুন মাস পর্যন্ত)-র তুলনা করলে নিচের তথ্যগুলি পাওয়া যায়; এক, দ্বিতীয় সমীক্ষার তারিখে প্রথম সমীক্ষার সময়ের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি গ্রামীণ পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়েছে; দুই, ঋণগ্রস্ত গ্রামীণ পরিবারগুলিতে ঋণের পরিমাণ দ্বিতীয় সমীক্ষার তারিখে প্রথম সমীক্ষার চেয়ে ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; তিন, দুই সমীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে কৃষিজীবী পরিবারগুলির মোট সম্পদের পরিমাণ গড়ে ৩৩ শতাংশ এবং অ-কৃষিজীবী পরিবারগুলির গড়ে ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই সব হিসেবই কিন্তু হোলসেল মূল্য-সূচক অনুসারে প্রাপ্ত 'প্রকৃত' হিসেব, সাধারণ গড়পড়তা হিসেব নয়।

দেশের শহরাঞ্চলেও ছবিটা মোটের ওপর একই রকম। পরিবার-পিছু গড় সম্পদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে (স্বনিযুক্ত পরিবারগুলির ক্ষেত্রে ২৯ শতাংশ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ)। ঋণগ্রস্ত পরিবারগুলির সংখ্যা কমবেশি একই থাকলেও পরিবার-পিছু গড় ঋণের পরিমাণ দুটি সমীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা একটা সন্দেহাতীত ঘটনা, যাকে অন্য কথায় বললে বলা যায়, এক বিপুল-সংখ্যক ভারতীয় পরিবারের মোট সম্পদের পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও ঘটে চলেছে। গ্রামীণ জনসংখ্যার যে অংশ মাথাপিছু দৈনিক ২২০০ ক্যালরি জোগাড় করতে পারত না, ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০১১-১২-র মধ্যে তাদের অনুপাত ৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৮ শতাংশ হয়ে গেছে। এবং শহরাঞ্চলে এই সময়ের মধ্যে এই অনুপাতটি ৫৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫ শতাংশ। শহরের মানদণ্ডটি ২১০০ ক্যালরি, এবং এই মানদণ্ডগুলি দেশের পূর্বতন যোজনা কমিশন স্থির করেছিল।

২০১৭-১৮ সালের ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্টে দেখা যায় সমস্ত পণ্য এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় প্রচুর কমে গেছে। সেই রিপোর্ট এতটাই অস্বস্তিকর ছিল যে এনডিএ সরকার সেটাকে দ্রুত পাবলিক ডোমেইন থেকে সরিয়ে ফেলে।

এই সরিয়ে নেওয়ার আগে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে (ধরে নেওয়া যাক প্রতি-একক পুষ্টিবস্তুর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের মূল্য পাল্টায়নি) তাতে এটাই বেরিয়ে আসে যে শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত ২০১১-১২-তে কমবেশি একই থাকলেও গ্রামীণ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সেই অনুপাতটা বেড়ে ৮০ শতাংশেরও অনেক বেশিতে পৌঁছেছে।

এবার এই ভয়ানক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আসুন দেখা যাক বিশ্বব্যাঙ্কের 'চরম দারিদ্র্য'-এর রিপোর্ট কী বলছে। আগেই বলেছি এই রিপোর্টে দৈনিক গড় ব্যয়ের মানদণ্ড ধরা হয়েছে ১.৯০ ডলার, যাঁরা এই খরচটা পারেন না, তাঁরাই চরম দরিদ্র। তো সেই হিসেবে বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট জানিয়েছিল ২০১১-১২ সালে ভারতের ১২ শতাংশ মানুষ এই চরম দারিদ্র্যসীমাদয় রয়েছে। এটাও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ এবং কমিয়ে দেখানো; কেন, তা বলেছি। কিন্তু এবার বিশ্বব্যাঙ্ক জানাচ্ছে ২০২২-২৩ সালে এই সংখ্যাটা মাত্র ২ শতাংশে নেমে এসেছে। ঘটনাচক্রে, দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের এই যে ১.৯০ ডলার দৈনিক ব্যয়ের মানদণ্ড, একে টাকায় পরিণত করলে দাঁড়ায় দৈনিক সমস্ত রকমের ব্যয়নির্বাহের জন্য ৫৩ টাকা মাত্র। আর এই মানদণ্ডটিও বিশ্বব্যাঙ্ক স্থির করেছে গরিব দেশগুলি, অবশ্যই নিজ-নিজ দেশের ব্যাঙ্কের পরামর্শমতো, তাদের দেশে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের যে মাপকাঠি স্থির করেছে সেগুলির একটা গড় করে। এটা বিশ্বব্যাঙ্কের নিজস্ব গণনা দ্বারা স্থির করা কোনও মাপকাঠি নয়। এখন এইসব দেশগুলির যে দারিদ্র্যসীমা বা দারিদ্র্য পরিমাপ-ব্যবস্থা সেগুলিও একই দোষে দুষ্ট। সব ক্ষেত্রেই মূল্য-সূচকের মাধ্যমে ব্যয় পরিমাপ করা হয় যাতে জীবনযাত্রার প্রকৃত ব্যয়বৃদ্ধিকে অনেকটাই কমিয়ে দেখানো হয়। ফলত, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সরকারই দারিদ্র্য কমিয়ে আনার বা নির্মূল করার যে-সব প্রচার চালায় বিশ্বব্যাঙ্কের এই সমীক্ষা সেগুলিকেই অনুমোদন জোগায়।

অতএব, 'কয়েক মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্র্যের বাইরে বের করে নিয়েদ আসা-সম্পর্কিত যাবতীয় কথাবার্তা একটি নিষ্ঠুর রসিকতার বেশি কিছু নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আগামী দিনগুলিতে আমরা এ-জাতীয় কথাবার্তা আরও শুনতে চলেছি। কারণ, কেমনভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্ধারণ করে দেওয়া 'স্থিতিশীল উন্নয়েনর লক্ষ্যমাত্রা' হাসিল করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ❐

পাকিস্তানের 'দুবাই' গদরে কেন বালুচদের প্রতিরোধ আর আক্রমণ

শাহ মির বালুচ ও হান্না এলিস পিটারসন

চীনের অর্থায়নে বেলুচিস্তানের গদরে নির্মিত পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ছোট একটি বন্দরনগরী গদর। সেখানে চীনের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে একটি বিমানবন্দর। বিমানবন্দরটি বর্তমানে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ এটিকে আখ্যা দিয়েছেন 'পাকিস্তান ও চীনের সহযোগিতার প্রতীক' হিসেবে।

এই প্রকল্প ঘিরে বাস্তবতা কিছুটা ভিন্নচিত্র তুলে ধরে। ২০ জানুয়ারি বিমানবন্দর উদ্বোধনের দিন পুরো গদর শহর কঠোর নিরাপত্তার আওতায় ছিল। অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের শীর্ষ সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকলেও চীনা সরকারের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। যদিও বিমানবন্দরটির নির্মাণের খরচ ২৩ কোটি ডলার চীনই বহন করেছে। চীনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি গভীর সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে গদর চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (সিপিইসি) প্রাণকেন্দ্র। ২০১৫ সালে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের অধীনে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে চীন পাকিস্তানে প্রায় ৬২ বিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিমানবন্দর, মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র।

পাকিস্তানে গত এক দশকের অস্থিরতার পর সিপিইসির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দরিদ্র বেলুচিস্তান অঞ্চলে চীনের প্রভাব এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে গদরে চীনের প্রকল্পগুলো স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

'পাকিস্তানের দুবাই' হিসেবে গদরকে রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় চীনের প্রতি স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ বেড়েছে। তাদের অভিযোগ, এসব বিনিয়োগকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে শহরটি কার্যত একটি উচ্চ নিরাপত্তা কারাগারে পরিণত হয়েছে। চীনা কর্মীদের জন্য আলাদা এলাকা, নিরাপত্তাচৌকি, ব্যাপকসংখ্যক পুলিশ এবং সামরিক উপস্থিতি শহরের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

গদরে বেশ কিছু প্রকল্প স্থানীয় জনগণের তীব্র অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একটি উদাহরণ গভীর সমুদ্রবন্দর। বন্দরটি থেকে যে মুনাফা হয়, তার ৯০ শতাংশ চীনাদের হাতে যায়। ফলে স্থানীয় জেলেরা সমুদ্রের ব্যবহার থেকে প্রায় বঞ্চিত। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের নৌকাগুলো নিরাপত্তাবাহিনী বারবার তল্লাশি করে। বন্দর থেকে তাঁদের কোনো লাভ তো হচ্ছেই না, বরং তাঁদের জীবিকা নির্বাহে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

সিপিইসি পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের রোষানলে পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ইসলামিক স্টেট এবং পাকিস্তান তালেবান। এ ছাড়া বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) নামের একটি আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী চীনের বিরুদ্ধে সম্পদ শোষণের অভিযোগ এনেছে। সিপিইসি বন্ধ করতে তারা সহিংস অভিযান শুরু করেছে। গত অক্টোবরে করাচি বিমানবন্দরের কাছে একটি সন্ত্রাসী হামলায় দুই চীনা নাগরিক নিহত হন। এর আগে বিএলএর বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী বোমা হামলা ও গুলিতে চীনা ও পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রাণহানি ঘটেছে।

চীনা কর্মীদের নিরাপত্তা এখন সিপিইসির জন্য বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রকল্পটির দ্বিতীয় ধাপ এখনো শুরু করা যায়নি। মূল পরিকল্পনা অনেক ছেঁটে আনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। চীন ইতিমধ্যে পাকিস্তান থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী সরিয়ে নিয়েছে। গদরে নতুন কোনো চীনা কর্মী এলেই সামরিক-গ্রেডের নিরাপত্তাব্যবস্থা জারি করা হয়। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।

চীনের রাজনৈতিক সচিব ওয়াং শেংজি এক সাক্ষাৎকারে চীনের বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, 'যদি নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, এই পরিবেশে কে কাজ করতে আসবে? গদর ও বেলুচিস্তানে চীনাদের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে'। শেংজি আরও উল্লেখ করেন যে পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকরা এমন প্রকল্প চেয়েছেন, যা অর্থনৈতিকভাবে তেমন কার্যকর নয়। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের অভাবে সাধারণ মানুষ চীনের বিনিয়োগের সুফল পাচ্ছে না। শেংজির মতে, পাকিস্তান সরকার সিপিইসি নিয়ে 'অবাস্তব আশার কথা'র কথা প্রচার করছে। ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অবাস্তব প্রত্যাশার জন্ম নিয়েছে। চীনের বিনিয়োগের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি যতটা না অর্থনৈতিক, তার চেয়ে বেশি সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত। যেমন কেন গদরের মতো মাত্র দেড় লাখ লোকের এক দরিদ্র শহরে পাকিস্তানের বৃহত্তম বিমানবন্দর তৈরি করা হলো?

গদরে নির্মিত গভীর সমুদ্রবন্দরটিও বাণিজ্যিকভাবে বিশেষ কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। গত পাঁচ বছরে বন্দরটিতে যে সামান্যসংখ্যক বাণিজ্যিক জাহাজ নোঙর করেছে, তাদের বেশির ভাগই আফগানিস্তানে যাওয়ার পথে শুধু ট্রানজিটের জন্য থেমেছে। বন্দরটি বর্তমানে লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। এসব বাস্তবতা চীনা বিনিয়োগের কার্যকারিতা এবং পাকিস্তানে সিপিইসির দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে। গদরের গভীর সমুদ্রবন্দর এবং বিমানবন্দর সামনে রেখে চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় যে চীন বন্দরটিকে তার নৌবাহিনীর একটি কৌশলগত ঘাঁটি এবং বিমানবন্দরটিকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়।

পাকিস্তানে চীনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে কাজ করা কর্মকর্তারা বলেন যে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির বাহিনীকে পাকিস্তানে আনার এবং গদর বন্দরে চীনা নৌবাহিনীর জাহাজ ও সাবমেরিনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি চীনের 'পুরোনো দাবি'। তা না হলে চীন পাকিস্তানকে চাপে রাখতে ঋণ পরিশোধ আর ভবিষ্যৎ সিপিইসি বিনিয়োগ আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। এটি পাকিস্তানের জন্য এক বড় আঘাত হতে পারে। কারণ, দেশটি মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে। তার বিদেশি মুদ্রা ও বিনিয়োগের বেশি বিকল্পও নেই।

চীনের এই সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেরও দীর্ঘদিনের উদ্বেগ রয়েছে। দুই দেশই চীনকে সরাসরি নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে দেখে। চীনা রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি পাকিস্তানি পাওয়ার কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। সূত্র অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ চাপের কারণেই তা হতে পারেনি। পাকিস্তান এখনো চীনের ওপর নির্ভরশীল। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখাও দরকার। দেশটি এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে লড়াই করছে।

সিপিইসি প্রকল্পগুলোকে চীনের সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য কোনো চুক্তি হওয়ার কথা পাকিস্তানের সরকারি ও সামরিক উভয় পক্ষই অস্বীকার করেছে। তবে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সরকার বর্তমানে চীনের সঙ্গে দর,কষাকষিতে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। গত বছর চীন সফরে শাহবাজ শরিফ চীন থেকে ১৭ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগের অনুরোধ করলেও তা ইতিবাচক সাড়া পায়নি।

এভাবে চলতে থাকলে চীন সিপিইসি প্রকল্পগুলোর ব্যাপ্তি কমিয়ে আনতে পারে। তবে পাকিস্তান থেকে তার পুরোপুরি সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চীনের ভূরাজনৈতিক কৌশলের জন্য পাকিস্তান এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান। ❐

লেখাটি ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত।

শাহ মির বালুচ গার্ডিয়ানের দিল্লি প্রতিনিধি। হান্না এলিস পিটারসন গার্ডিয়ানের দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি। গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে অনুবাদ জাভেদ হুসেন)

চাকদায় ISRDS এর উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রম প্রচ্ছায়া'র দ্বারোদঘাটন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টির, রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক মিহির সিংহ রায় সমমনোভাবাপন্ন ব্যাক্তিদের নিয়ে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কল্যাণী ইনস্টিটিউট ফর সোসিও ইকোনমিক ডেভলপমেন্ট অ্যান্ডরিসার্চ স্টাডিজ (ISRDS)। সেই থেকে চাকদা থানার বাগান বাড়ি, তাতলায় এই সংস্থা দরিদ্র মানুষদের জন্য কাজ করে আসছে। মিহির সিংহ রায় ২০১৭ সালের ১২ জানুয়ারি প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাই খোকন সিংহ রায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে এই গঠনমূলক কাজ অব্যাহত রাখেন। গত ১১ জানুয়ারি দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার সার্থকরূপ দেওয়া হল সংস্থার গড়া বৃদ্ধাশ্রম 'প্রচ্ছায়া' র দ্বিতল ভবন দ্বারোদ্ঘাটনের মাধ্যমে। আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন জননেতা বাসুদেব গাঙ্গুলী। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সপ্তাহ পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

করেন অধ্যাপক বিপ্লব দাস গুপ্ত। পতাকাউত্তোলন করেন সংস্থার সভাপতি সন্তোষ বিশ্বাস। বক্তারা সকলেই মিহির সিংহ রায়েরস্মৃতিচারণ করে তাঁর নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য ও কর্মধারার কথাবলেন।

ISRDS অর্থাৎ ইনস্টিটিউটঅপ সোসিও ইকোনমিক ডেভলপমেন্ট রিসার্চসেন্টার এন্ডস্টাডিস এর সম্পাদক খোকন (সমর) সিংহ রায় তাঁর বক্তব্যে জানান প্রাথমিক ভাবে এখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বনির্ভরতার জন্য সেলাই শিক্ষা ও সেলাই মেশিন প্রদান, কম্পিউটার শিক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, অঙ্কন শিক্ষা, বিনামূল্যে শিক্ষা ও প্রতিদিন ১৫ /২০ জন্য ৩ বেলা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে। নতুন সংযোজন হলো এই 'প্রচ্ছায়া ' বৃদ্ধাশ্রমের। এখানে দরিদ্র শ্রেণির ২০ জনের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভরণপোষণ ও থাকারব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতল গৃহে ৫ টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরে স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় ৪ জন করে থাকতে পারবেন। খোকন বাবু জানান দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণির জন্য এই সব কাজে নিয়োজিত থাকাই এই সোসাইটির লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে মিহির সিংহ রায়ের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সহকর্মীরা অনেকে, প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। ❐

ড. বি.আর.আম্বেডকর ও সংবিধানকে অপমান সঙ্ঘ পরিবারের

অমিতাভ সিংহ

বেশ কিছুদিন আগে রাজ্যসভায় সংবিধান সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ডঃ বি আর আম্বেদকরের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অবমাননাকর উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ' আজকাল একটা ফ্যাশান হয়েছে.... আম্বেদকর আম্বেদকর আম্বেদকর..... এতবার ভগবানের নাম করলে সাত জন্মের স্বর্গবাস হয়ে যেত।' এই ধরনের মন্তব্য তিনি যে দলের উত্তরাধিকার বহন করছেন, তাঁদের মতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কারণ সংবিধান প্রণয়নের সময় বিজেপির মাস্টারমাইন্ড আরএসএস বা হিন্দু মহাসভা তার বিরোধীতা করেছে।তারপর তাদের বংশধর বিজেপিও একই কাজ করেছে বা করে চলেছে।এবার বিজেপি এককভাবে ক্ষমতায় এলে এই সংবিধানকে পাল্টে দিয়ে যে মনুস্মৃতি নির্দেশিত সংবিধান তৈরী করত তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশনে আলোচনাক্রমে তাদের সুপারিশমত একটা অন্তবর্তী সরকার গঠনের ও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটা গণপরিষদ গঠন করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হয়।ইতিমধ্যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা ভোটদান করে ৩৮৯ জন সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ গঠন করে। মুসলীম লীগের নির্বাচিত ৭৩ জন সদস্য গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করে।ফলে তৎকালীন বড়লাট ওয়াভেল গণপরিষদ ডাকতে না চাইলেও পন্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেস বলে মুসলিম লীগের নীতি হচ্ছে ' তাঁরা গাছেরও খাবে তলারও কুরোবে। তারা মন্ত্রিত্ব করবে আবার গণ পরিষদ বয়কট করবে। এটা চলতে পারেনা।' কংগ্রেসের চাপে ওয়াভেল গণপরিষদের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন।মুসলিম লীগ গণ পরিষদ বয়কট করে।দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্থান পৃথক হয়ে যায়। ভারতের গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৯ জন। প্রায় তিন বছরে ১৬৬ দিন ধরে চলা ১২ টি অধিবেশনের পর সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হয়।

১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু সংবিধানের লক্ষ্য সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁর এই বক্তৃতায় নিরন্ন ও বস্ত্রহীন মানুষের জন্য অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থার কথা বলেন ও তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সমান সুযোগদানের নিশ্চিতিকরণের কথা উল্লেখ করেন। বস্তুত এটাই আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা বা প্রিয়াম্বেল। ৯ ডিসেম্বর গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গ্রহণ করেন।সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া রচনা করেন বি এন রাউ, ICS. স্বাধীনতার পর ডঃ আম্বেদকরকে আইনমন্ত্রী করা হয় ও তাঁকে সংবিধান খসড়া কমিটির কনভেনর নিযুক্ত করা হয়। বি.এন.রাউকে গণ পরিষদের ADVISOR নিযুক্ত করা হয়। ড. আম্বেদকর গণ পরিষদে বিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানের বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত করেন। সংবিধান প্রণয়নের জন্য মোট ১৬ টি প্রধান কমিটি গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে তিনটি করে কমিটির প্রধান ছিলেন জওহরলাল নেহেরু ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এছাড়া ডঃ আম্বেদকর, বল্লভভাই প্যটেল পট্টভি সিতারামাইয়া, হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী,জেবি কৃপালনী,কৃষ্ণস্বামী আয়ার,কেএম মুন্সী, জিভি মবলঙ্কার,গোপীনাথ বরদলৈ,এভি ঠক্কর একটি করে কমিটি বা সাব কমিটির শীর্ষে ছিলেন।

পন্ডিত নেহেরু ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংবিধানের লক্ষ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণার কথা সবিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন মহাত্মার ইচ্ছা ছিল একজন অস্পৃশ্যা নারী দেশের রাষ্ট্রপতি পদে বসবেন।

ড. আম্বেদকর ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী। তিনি প্রথমে গণ পরিষদ বয়কট করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র (খুলনা) পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় তিনি আর গণ পরিষদের সদস্য থাকতে পারলেন না। তখন গান্ধীজির নির্দেশে পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস মহারাষ্ট্র থেকে একটি আসন শূন্য করিয়ে সেখান থেকে ড. আম্বেদকরকে নির্বাচিত করিয়ে আনেন। কংগ্রেস অত্যন্ত উদার মনের পরিচয় দেয়

১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর অর্থাৎ গণ পরিষদের অন্তিম অধিবেশনের আগের দিন আম্বেদকর এক মর্মস্পর্শী ভাষণে সংবিধান খসড়া কমিটির কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। তিনি ধন্যবাদ জানান খসড়া কমিটির সকল সদস্যকে, ধন্যবাদ জানান সাহায্যকারী কর্মীদের। এবং তিনি ধন্যবাদ জানালেন সেই পার্টিকে (পড়ুন কংগ্রেস) , তিনি সারা জীবন ধরে যে পার্টির বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি বলেন 'পরিষদ কক্ষের ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেসের নেতারা শান্তভাবে কাজ না করে গেলে তাঁর পক্ষে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা বার করে আনা সম্ভব হত না। কংগ্রেস পার্টির এই শৃঙ্খলার সুবাদেই খসড়া কমিটির পক্ষে প্রত্যেকটি ধারা ও প্রত্যেকটি সংশোধনীর পরিণতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে খসড়া সংবিধানকে গণ পরিষদে ঠিক মতন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।' (গাঁধী উত্তর ভারত- রামচন্দ্র গুহ ,পৃষ্ঠা -- ১০৭- ১০৮)

এই সংবিধানের অনুলিপি ও সচিত্র অলংকরণনের দায়িত্ব নেহেরুজি দেন যথাক্রমে বিখ্যাত ক্যালিওগ্রাফার প্রেমবিহারি নারায়ণ রায়জাদা ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুকে। ভারতের প্রাচীন ও বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত ইতিহাস চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা আছে। মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের ছবিও সেখানে রয়েছে। পণ্ডিত নেহরু নিজের ছবি সেখানে রাখতে যান নি।

এই সংবিধানের অমর্যাদা বিজেপি প্রতিনিয়তই করে চলেছে তাদের কার্যধারার মাধ্যমে।গণতন্ত্র হত্যা যার অন্যতম। নিরন্ন মানুষকে অন্ন দেওয়ার বদলে তাদের নিশ্চিহ্ন করে কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায়ীদের সম্পদ বাড়ানোর সুযোগ,সরকারের বিরোধীতা করলেই দেশদ্রোহী আইনের বলে দিনের পর দিন বিনা বিচারে জেলবন্দী করে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো,ছাত্র ছাত্রীরা আন্দোলন করলেই গ্রেপ্তারি তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

ইতিমধ্যে ডঃ আম্বেদকরকে অসম্মান করার জন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যে এক সরকারী কর্মচারী চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেস ক্ষ্ম জয় বাপু জয় ভীম জয় সংবিধান ক্ষ্ম স্লোগান দিয়ে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে প্রতিদিন দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। গত ২৭ জানুয়ারি ডঃ আম্বেদকরের জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের মহু'তে মোদী ও যোগীকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে বলেছেন গঙ্গায় ডুব দিয়ে দেশের মানুষের দারিদ্র দূর হয় না। রাহুল গান্ধী কর্মীদের মতাদর্শের লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করে বলেন যেখানে সংবিধানের অপমান হবে সেখানে যেন সবাই মিলে রুখে দাঁড়ান। মোহন ভাগবতের উক্তি রামলালার প্রতিষ্ঠার দিন দেশ স্বাধীন হল, এর তীব্র বিরোধীতা করে বলেন এর ফলে দেশের সংবিধানকে তো অপমান করা হয়েছেই একইসঙ্গে ডঃ আম্বেদকরকেও অপমান করা হয়েছে। এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বহুজন সমাজ পার্টি প্রতিষ্ঠাতা কাঁসিরামের ভগিনী স্বর্ণ কাউর। ❐